ঘরের ঠিকানা

সুশীল জানা

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
অগাস্ট—১৯৫৩

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিমিটেড
১৫-এ ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট ও আর্ট প্লেট
মোহন প্রেস
২ কর্ন্সিচার্চ লেন
কলিকাতা ৯

বাঁধিয়েছেন
মডার্ন বাইণ্ডাস

দাম : দু'টাকা বারো আনা

উৎসর্গ

অগ্রজ সাহিত্য-সঙ্গী

স্বর্গত রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

বই প্রসঙ্গে—

বিরাট একটি অঞ্চলের খণ্ড খণ্ড কোণায় সংগ্রাম তরঙ্গে আবির্ভূত হয়েছে যে নতুন মানুষেরা—তাদের সেই জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে তাকিয়ে বছর দুই আগে 'ঘরের ঠিকানা' রচনার কথা মনে আসে। জাতিতে গোষ্ঠীতে ভিন্ন ভিন্ন তারা, গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়ানো—তবু অনাগত কালের অলিখিত এক মহাকাব্যের চরিত্র ভূমিকায় তারা সারিবদ্ধ হচ্ছে—সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাত্মক ধ্বংসভূমি থেকে পর পর বহু সংগ্রামের ক্ষেত্রে। সেখানে সমস্ত ভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও আমি দেখেছি একটি পরিবারকেই—নতুন প্রতিশ্রুতিতে সুমহান। 'ঘরের ঠিকানা' সেই পরিবারেরই উদ্দেশ রচনা। কাহিনী স্থান—মেদিনীপুর, রাঙামাটির দেশ আদিবাসী অঞ্চল থেকে রেল কলোনী এবং নোনামাটির দেশ সমুদ্র-সৈকত পর্যন্ত। পাত্রপাত্রী ভিন্‌দেশী, আদিবাসী ও মৃত্তিকালগ্ন সাধারণ মানুষেরা। গ্রথিত হয়েছে তারা গত আট-দশ বছরের সংগ্রাম-মুখর একটি কালে। তাদের প্রত্যেকের জীবনে এ সংগ্রাম এসেছে বারবার—প্রত্যেকের কাহিনীতে হয়তো সে কথা পুনরাবৃত্তি দোষের মতোই মনে হবে। তবু, আমার লাভ—তাদের বিচিত্র জীবন-রূপ। এই হলো 'ঘরের ঠিকানা'র স্থান-কাল-পাত্রের কথা।

সু. জা.

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

পদচিহ্ন

শেওলা

গ্রামনগর

বিপ্লবের ডাক (উপন্যাস)

মহানগর ,,

বেলাভূমির গান ,,

ঘরের ঠিকানা :

বেটা

বহিন

নায়ক-নায়িকা

সখা

আম্মা

বেটি

ভাই

বউ

জনক

ঘরের ঠিকানা

মনে হলো নতুন জায়গায় এলুম। কোথাও কিছু যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে এ মুসাফিরখানার।

অথচ সবই তো ঠিক আছে! সেই ছুটোছুটি, যাওয়া-আসা, রুজি-রোজগারের ধান্ধা—দর কষাকষি। সেই ঘন্টিম্যান চৈতন্য, মুচি ধরিছন, তারি। তাই তো! এতক্ষণে মনে হলো, একটা বাচ্চা নেই। ঝিমোনো মুমূর্ষু মুসাফিরখানাটাকে জীইয়ে তুলতো যে পলকে পলকে!

জিজ্ঞেস করলুম, 'সে বাচ্চাটা গেল কোথায়?'

ধরিছন মিস্ত্রি বললে, 'ফ্যানা? সে তো নাই বাবু।'

'গেল কোথায়?'

'মরে গেল।'

ধরিছন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। এক-পাটি ছেড়া জুতো সে সেলাই করছিল। হাতের কাজ থামিয়ে বসে রইলো সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে—মনে হলো, তলিয়ে যাচ্ছে সে মনের গভীরে। আস্তে আস্তে বললে আবার, 'সেদিন রাত ভর বহুৎ কেঁদেছিল বাচ্চাটা।'

'কেন?'

'যাবে সে ঘর, যাবে সে গাঁয়, যাবে সে মায়ের কাছে। কিন্তু কোথায় তার কি আছে এ দুনিয়ায়! কোথায় পঁহুছে দিব তাকে!'

'তারপর?'

'সব শুনলে মোদের কাছে। কি বুঝলে বাচ্চাটা কি জানি—রাতভর কান্নাকাটি করলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তারপর কখন ভোর রাতে রেলে উঠতে গিয়ে—'

ধরিছন থেমে গেল। ওর শুকনো বুড়ো চোখ দুটো শেষ বিন্দু অশ্রুকণাগুলি নিংড়ে নিংড়ে যেন সজল হয়ে উঠলো। ঠোঁট দুটো নড়তে লাগলো নিঃশব্দে।

তারপর কখন অন্ধকারে ভরে গেল এ মুসাফিরখানাটা। আর সেই ঘন গভীর অন্ধকারে প্রাণ পেল যেন সেই বাচ্চাটা। দাঁড়ালো সামনে এসে। অন্ধকারে চোখ মেলে দিয়ে বসে আছি ওর দিকে চেয়ে। ওর গভীর কচি কচি দুটো চোখে যেন মরুভূর তৃষ্ণা: ওর ঘর চাই—ওর গাঁ চাই—ওর স্বজন পরিজন চাই! ···

রাত্রির অন্ধকারে মুসাফিরখানা ভরে মনে হলো তার ফোঁপানী কান্নাটা কাঁপছেই—অবোধ বালকের অশ্রান্ত ফোঁপানী। কবে কেটে গেছে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—সেদিনের বিড়ম্বনার মধ্যে ওর জন্ম। তারপর ধ্বংসের বছরগুলোর মধ্যে দিয়ে ওর যাত্রা সুরু। গ্রাম ভাঙলো, ঘর ভাঙলো—জীবনগুলো ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল কাচের টুকরোর মতো। তার মধ্যে দিয়ে জীবনে ও মাত্র দশটি বছর চলেছে। চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে আজ—ওর নরম অভিজ্ঞতার শ্যামল আস্তরণে গভীর গর্জন করে একটা পাগাড়ের চুড়ো ভেঙে পড়লো যেন। ঘন্টিম্যান চৈতন্য আর মিস্ত্রি ধরিছন এক লহমায় যেন বালকের সব স্বপ্নটুকু রূঢ় হাত দিয়ে মুছে নিল। নেই—ওর মা নেই, গাঁ নেই—স্বজন

পরিজন কেউ নেই! ... ওর স্মৃতি শূন্য হয়ে গেল—ওর সামান্য একটুখানি জীবনের বঞ্চনাগুলো তাকালো ভয়াবহ মুখ তুলে। তারা যেন সব ভুতুড়ে ছায়া—সেই উঁচু উঁচু নারকেল গাছ, তেল কলের চোঙ—ওর বাপ ... ওর মা! সবগুলো ভুতুড়ে ছায়ার মতো হাত নেড়ে ডাকতে ডাকতে কোথায় মিলিয়ে গেল শূন্যে। ও কাঁদছে। কি বিশ্রী চাপা কান্না—মাত্র দশ বছরের বঞ্চনার, দশ বছরের ধ্বংস কালের। সে কান্না অন্তরাত্মাকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি শুনছি। ভোর হতে দেরি আছে। রহস্যময় জটিল ধাঁধার মতো ভোরের আগের অন্ধকারে ফোঁপানীটা যেন কাঁপছেই।

ক্ষুধার্ত সেই কান্নার তরঙ্গ ঠেলে, দু-হাতে শেষ রাতের কম্পমান অন্ধকার সরিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় জেলখানার সেই মুখগুলো। জেলখানার আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে যে লোকটা হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠেছিল ঘানি ঠেলতে ঠেলতে:

'লক্ষার জলায় সবাই এখন আবাদে নেমে পড়েছে গো!—মা বসুমতীর সঙ্গে এবার মোর ছাড়াছাড়ি!'—

জেলখানার প্রাঙ্গনে ঘনঘোর ক্ষুধার্ত এক শরতের সন্ধ্যায় কে বলেছিল:

'সে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।' ...

আর ফাল্গুনের সুরুতে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা যখন চমকে দিয়েছিল ঘানি-টানা কয়েদীগুলোকে, তখন বুনো দেশের কোন মানুষটা যেন বলে উঠেছিল:

'হঠাৎ একদিন সাধ ক'রে সে খোঁপায় ফুল পরেছিল।' ...

তারা ভীড় করে আসে সবাই। ভীড় ক'রে আসে এই আধা পাহাড়ী কাঁকর মাটির দেশ থেকে, রেল কারখানা থেকে সুদূর নোনামাটির দেশ পর্যন্ত ছড়ানো আরও অনেকগুলি মুখ—তাদেব স্বপ্ন, তাদের আশা-আশ্বাসে ভরা জীবন। তাদের কথাই বলেছিল কারান্তরালের মুখগুলি।

'বহিনকে বোলো সাহসে বুক বাঁধতে।'

'বোলো—জঙ্গলের স্বপ্ন আর শান্তি ঘুরে আসবে আবার।'

'বোলো—ঘরে ফসল তোলার দিন এলো এবার।' ...

তারা যেন সবাই জড়ো হয়ে আসে এই অন্ধকারে—বালকের নিরবচ্ছিন্ন ফোঁপানী ঘিরে, মেয়ে আর মরদের দল। কণ্ঠস্বর কাঁপে ওদের অন্ধকারকে মথিত করে।

'আরে ভাইয়া, চল হামোর সাথ—চল কসবী গ্যাঙে। কাঁদিস না।'

রঙ্গী না? রেল-কারখানার মজুরনি বনোয়ারীর বহিন রঙ্গী!

পরণে ঘাঘরা, গায়ে কালচিটে একটা আঙিয়া—তার ওপরে একটা ছেঁড়া ওড়না, একটি যুবতী মেয়ে এগিয়ে এলো বাচ্চাটার দিকে অস্পষ্ট অন্ধকার ভেঙে। কান্না ভেজা মুখটা তুলে ধরলো উল্কি আঁকা বলিষ্ঠ দু-হাতে। মুখটাকে চেপে ধরলো বুকের ওপরে। বললে, 'আরে ভাইয়া, হামি তোর বহিন আছি। তোর বহিন রঙ্গী।'

'না না। কে তুমি!'—

'হায় রে ভাইয়া—চিনিস না হামাকে, কসবী গ্যাঙের বহিন রঙ্গীকে! যেতিস না তুই হামাদের উদিকে ঘুড়ি ধরতে, কসবী গ্যাঙের কত ভাই-বহিনের সঙ্গে খেলতে, সোনা পোকার পেছন পেছন ছুটতে!'

বাচ্চাটা ফোঁপাচ্ছে সমানে রঙ্গীর নরম বুকের ওপরে মুখ গুঁজে—হয়তো সেখানে আত্মীয় হৃদয়ের কিছুটা উষ্ণতা পেয়েছে। রঙ্গী ডাকলো, 'এ মতিয়া, এ বহিন সল্মা—লে ভাইয়াকে হামোর, হামোর দুসরা বনোয়ারী ভাইয়া।'—

আরও দুটি মেয়ে এগিয়ে এলো—যুবতী। রঙ্গীরই যেন ছায়া তারা—দু-জনে এসে দু-দিক থেকে হাত ধরলো বাচ্চাটার। সে কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিল ঝটকা মেরে।

'না না'—

রঙ্গী হেসে বললে, 'আরে ভাইয়া—এরা যে তোর বহিন আছে। আরও কত বহিন আছে কসবী গ্যাঙে। চল—হামরা সবাই মিলে তোকে মানুষ করবো—বড় করবো।'—

অস্পষ্ট অন্ধকার ভেঙে ভেঙে রঙ্গীর কথাগুলো যেন হাতুড়ী পিটছে—ওর তামা পোড়া মুখে সুদৃঢ় বিশ্বাস. চোখ দুটো অভিজ্ঞতায় কঠোর—দেহের দৃঢ় কাঠামোটায় বলিষ্ঠ নির্ভর। ওরই ছায়ার মতো মেয়ে দুটি—হাত ধরে আছে বালকের। ওদের দেহ—ওদের চোখ মুখ কণ্ঠ এক সঙ্গে কথা বলছে যেন—সবটা একত্রে অনর্গল ভাবে ঝরে পড়ছে রঙ্গীর কণ্ঠ থেকে।

'কাঁদিসনি ভাইয়া। বড় হ'—তখন বুঝবি, তখন কাঁদবিনি আর। বুঝবি তখন তোর মা-বহিনের হাল—কেমন ক'রে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যায় জীবন, কি জ্বালায় জনম দেয় তোদের। কসবী গ্যাঙে চল—বুঝবি সব। মানুষ করবো তোকে সেখানে। তারপর বনোয়ারী ভাইয়া ঘুরে আসবে যেদিন ফাটক থেকে তখন'—

কচি গলাটা যেন চীৎকার ক'রে অন্ধকারকে চমকে দিল. 'না না—ছেড়ে দাও মোকে। কোথাও কেউ নাই মোর—ওরা বলে ঝুট বাত্, গাঁও ঝুট—ঘর ঝুট।'

'গাঁও ঝুট—ঘর ঝুট তো চল্ হে মোর সঙ্গে। চলে যাই মোরা।'

অন্ধকার ভেঙে এগিয়ে এলো আর একটি লোক—জাতে সাঁওতাল। তার চেহারা দেখে বোঝা যায় না—যৌবন তার আছে কি গেছে। মুখে তার নির্বোধ সারল্য—চোখে তার গোঁয়াতুমি। সে বললে, 'ঝুটমুট—মোরও সব ঝুটমুট হয়ে গেছে এক কুড়ি বছর পরে হে। চল মোরা চলে যাই—অন্য কোথাও ঘর বাঁধি যেয়ে। কি বলিস কম্‌লা।'

একটি সাঁওতাল মেয়ে তাকালো সম্মতির চোখ তুলে। ওর মুখের বিষণ্ণ ক্লান্তি সরে গেল যেন এক মুহূর্তে। সে সাগ্রহে বললে, 'যাবে তুমি?'

'হাঁ যাবো'—সে বললে, 'হটলগর মাঝির যে কথা সেই কাম। আমি মেনে নিলম তোর কথা কম্‌লা, ইজ্জৎ দিব না—লড়াই করে বাঁচবো। চল্‌ কোথাও নতুন ক'রে ঘর বাঁধবো।'

কম্‌লার শ্রান্ত এক জোড়া চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

হটলগর বললে, 'চল হে চ্যাংড়া—কাঁদিসনি।' হাত ধরলো রোরুদ্যমান বালকের।

'কোথায় যাবে!' মংলা শুধালো এগিয়ে এসে।

হট্‌লগর বললে, 'যেখানে মোরা ঘর বাঁধবো!'

'কেনে যাবে!' মংলা বললো আস্তে আস্তে, 'ঘর ওর এইখানে আছে লগর মাঝি। বন্‌শী মাঝি বলেছিল না? কোথায় যাবে মোদের কত পুরুষের এই পাথর-কাটা জমি ছেড়ে—এই ডাঙা, এই জঙ্গল ছেড়ে! জঙ্গল যেদিন ঘুরিয়ে লেবো, জমিন যেদিন মোদের হবে—তুমিও ঘুরে আসবে লগর মাঝি। আর ওই চ্যাংড়া ফুল পাড়বে জঙ্গলে, লাচবে গাইবে—বাঁশী বাজাবে মোদের সেই চ্যাংড়া কালের মতো।'

কম্‌লার মতো সল্‌মার মতো আর একটি সাঁওতাল মেয়ে এগিয়ে এসে চেপে ধরলো বালকের হাত।—চোখ তার ভেজা ভেজা, প্রতীক্ষায় আর প্রত্যাশায় ভারাতুর, শান্ত। সে বন্‌শী মাঝির সয়া—মংলা।

মংলা বললে, 'বনশী মাঝি যতোদিন না ঘুরে আসে ততোদিন এ চ্যাংড়ার ভার রইলো মোর হাতে লগর মাঝি।'

ছেলেটা এক-রোখা কান্নায় ফেটে পড়লো আবার, 'না না—হাত ছেড়ে দাও মোর। কেউ নাই—কেউ নাই মোর।'—

'পাগল! কে বলে কেউ নাই! মথুর দাসের বেটি আছে না পান্তি?' বছর সতেরো বয়স হবে—একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো অন্ধকার ভেঙে। একটা ঝিমানো চোখের পাশে ডিম ঠেলে বেরোনো একটা কানা চোখ—

সর্বাংগ ওর বেঁকে গেছে, ঘাড়টা যেন ঠেলে একদিকে সরানো। ওর বেঁটে খাটো রোগা শরীরে এখনো যেন কৈশোর লেপ্‌টে আছে। কে বলবে সে সতেরো বছরের ডাগর মেয়ে! পান্তি বললে, ‘চল্‌ মোর গাঁয়ে—মোর বাপের ঘরে। মোদের গাঁয়েব মাঠে ছুটে তুই শেষ পাবি না, মোদের ধানে ভরা গোলায় বাসা বেঁধেছে লক্ষ্মী পায়রার জোড়। খামারে কত পাখীর ঝাঁক। দেখবি চল—ঘুরে পেয়েছি মোদের জমিন। মোদের খামার।’ …

মেয়েটা ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো আস্তে আস্তে। বলতে লাগলো গলা নামিয়ে, ‘পেটের জ্বালা—বড় জ্বালারে। যে আকালে গাঁ ছেড়েছিল তোর মা—তখন মোকেও বেচে দিয়েছিল মোর বাপ, শুধু পাচটা টাকায়—জানিস? ফ্যাল ফ্যাল ক’রে চেয়ে থেকেছি অচিন মানুষের দিকে, হ্যাঁ—কেঁদেছি, তোর মতোই কেঁদেছি। নিঠুর বাপ মোর একদিন পেটের জ্বালায়’—

‘পান্তি!’ অন্ধকারে কান্নায় রুদ্ধকণ্ঠ বুড়ো একটি যেন আর্তনাদ ক’রে উঠলো অসহ্য যন্ত্রণায়।

‘সেদিন বদলে গেছে রে।’ অন্ধকার চমকানো ওই অশ্রুরুদ্ধ আর্তনাদ আর তার নিজের অতীতের দিকে চেয়ে চেয়েই যেন মেয়েটি বললে আস্তে আস্তে, ‘মাঠ ভরে আজ কতো ধান! আর বেচবে না কেউ কারুকে, আর ফেলে পালাবে না কেউ। গোটা গ্রামকে গ্রাম আজ আমাদের। চল আমাদের গাঁয়ে।’

কানা চোখটার পাশে একটি সেই ঝিমানো চোখের গভীর আশ্বাস, ওর বেঁকে দুমড়ে যাওয়া শরীরটায় পোড় খাওয়া দৃঢ়তা—আর ওর ধীর শান্ত গলার কথাগুলো কোথায় কোন গ্রামের জীবনকে যেন এই মরা অন্ধকারে সঞ্জীবিত করে তোলে। ছেলেটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে মুখ তুলে তাকালো ওর দিকে। ভয়ে—বিস্ময়ে।

‘দেখছিস মোকে! ভয় পাসনি—চোখটা গেলে দিল মোর হারামীরা, গলা

টিপে ঘাড়টা দুমড়ে দিলে।' বললে মেয়েটি তেমনি আস্তে আস্তে, 'ধরে নিয়ে গেছলো মোকে জমিদারের পাইক, দারোগা। আমি বলিনি—কিছুই বলিনি গাঁয়ের মানুষের কথা। ঝুলিয়ে রাখলো মোকে ঠ্যাং বেঁধে। ও কী রে—ভয় পাচ্ছিস! না না—মাঠ ভরে আজ কত ধান—মোদের জমিন মাঠ।'—

চোখে দু-হাত ঢেকে ভয়ে কেঁদে উঠলো ছেলেটা, 'ভয় করছে মোর—ভয় করছে তোমাকে দেখে।'

'ভয় করছে? তবে চলো মোদের গাঁয়ে ভাই।' অন্ধকার ভেঙে এগিয়ে এলো আর একটি মানুষ। অল্পবয়সী যুবক। বললে, 'ভয়ের রাজ্যি পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিয়েছি—মায় মোদের জমিন ভিটের বন্দকী দলিলের প্যাটরা পর্যন্ত। শোরের বাচ্চাগুলো পালিয়েছে সব ভয়ে।' বলে ডাকলো মুখ ফিরিয়ে, 'অ দাদা—এগিয়ে এসো দিকিন। লাও, হাত ধরো—তোমার আর এক ভাই।'

ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলো আর একটি চাষী—মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে, ঠাউরে ঠাউরে। বললে, 'কে বললি ভুবন?'

'তোমার আর এক ভাই। মোর মতোই ভাববে একে।'

'তোর মতো! তোর মতো!' রাত-কানা ঠাউরে চলা লোকটার গলা যেন কেঁপে উঠলো অবদমিত আবেগে। বললে, 'দে—হাতে ধরিয়ে দে তবে মোর। চল ভাই—মোদের গাঁয়ে আর ভয়-ডর নাই।'

এক অশ্রান্ত অসহায় ফোঁপানী ছাড়া কোনো জবাব পাওয়া যায় না বাচ্চাটার কাছ থেকে।

এমন সময়ে অন্ধকারে কোণ-ঘেঁষা একটি নতুন বউয়ের ফিসফিসানিতে পাৎলা অন্ধকারের পর্দা যেন শিউরে উঠলো। অর্জুন মণ্ডলের বউ। হাতে সুতোতে বাঁধা তার সবুজ ঘাস, পরনে হলুদে ছোপানো শাড়ী। পাশের জোয়ান মরদটিকে বললে, 'ওকে নিয়ে চলো।'

'তারপর?' পুরুষটি বললে।

'ওকে আমি সামলে নেবো।' বউটি বললে, 'বলো ওকে—ঘর আছে ওর মোদের গাঁয়ে, মা আছে ওর—সব আছে। চলুক ও মোদের সঙ্গে। আচ্ছা মোর কাছে এনে দাও ওকে, আমি ওকে ভুলিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু বাচ্চাটার হাতে ধরতেই সে চিৎকার ক'রে উঠলো, 'না না—আমি মাকে চাই—ছেড়ে দাও মোকে, মাকে আমি খুঁজে বার করবো।'

কারা যেন বিষণ্ণ চোখে চেয়ে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জিভে চুক্ চুক্ শব্দ ক'রে উঠলো ধরিছনের মতো।

অন্ধকার ভেঙে এগিয়ে এলো আর একটি মেয়ে। ছোট ছোট দুটি ছেলে জড়িয়ে আছে পায়ে পায়ে, আর একটি ছেলে ওর কোলে। গলায় ওর বেদে কাকমারার মতো কাচের মালা, শান্ত চোখে ওর কিসান জননীর স্নিগ্ধ ছায়া। আন্দি না?

সে এসে কান্নায় ফেটে-পড়া ছেলেটার মুখটা তুলে ধরলো এক হাতে—চেপে ধরলো নিজের নরম পেটের ওপরে। বললে, 'মাকে তোর খুঁজতে যেতে হবে না রে. এসেছি তোকে নিতে—চল। আমিই তোর মা। চল মোর সাথে।'

ছেলেটা এক-রোখা গলায় বলে উঠলো, 'মা নেই বলে যে ওরা সবাই!'

'ওরা জানে না।' আন্দি বললে আস্তে আস্তে, 'ওরা জানে না তোর এই মায়ের খবর।'—

কি জানি ওর নরম পেটের ওপরে পেয়েছে কি না মাতৃ জঠরের উষ্ণতা, ছেলেটা ফোঁপাতে লাগলো ওর পেটে মুখ গুঁজে। বললে, 'ওরা যে বলে'—

'বলুক যার যা খুশি।' আন্দি বললে, 'তবু আমি তোর মা। সমস্ত ঝড়-ঝাপটার মধ্যে তোদের সব অধিকারকে বুক দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছি আমি এতদিন।'

'ওরা যে বলে—ভুলে যা সব কথা।'—

'কে ভোলাবে তোদের মায়ের কথা!'—অন্ধকারে চোখ ঝল্‌সে উঠেছে বাঘিনী মায়ের। বললে, 'কে হটাবে মোকে তোদের অধিকার থেকে!'—

'ওরা যে বলে সব ঝুটমুট—গাঁ, ঘর, জমিন, বলদ-গোরু—মা বাপ'—

'না—আমি তোর বাপ।' ঝুলে পড়া পাকা ভুরুর তলা থেকে কঠিন শপথে যেন ফেটে পড়লো পরধানের গলা। সারা মুখমণ্ডল ভরে ওর বয়সের জীর্ণতা আর বঞ্চনার দাগ—তার মধ্যে থেকে চোকো চিবুকটা মুহূর্তে যেন কঠিন হয়ে উঠলো নতুন ক'রে আবার জীবন গড়ার প্রতিশ্রুতিতে। বললে, 'যে আগুনে জ্বলে গেছে তোর ওই এক ফোঁটা জীবনের স্বাদ—সেই আগুনে পুড়ে মরেছে আমার বারোটা ব্যাটা-বেটি, ঘর-সংসার, গাঁ। আবার বন কাটলম, গাঁ গড়লম—ঘর বাঁধলম। কিন্তু শূন্য ঘর মোর খাঁ-খাঁ করছে তবু। চল মোর সাথে—আমি তোর বাপ। যা হারিয়ে গেছে তোর—সব আবার ঘুরে পাবি মোর গাঁয়ে, চল।'

'সেই যে উঁচু উঁচু নারকেল গাছ—ধান কলের চোঙের পাশে, লক্ষ্মীর জলা—ধবলী গাই, মোদের খামার গোলা'—

'হাঁ হাঁ—আছে।' পরধানের গলা কেঁপে উঠলো, 'আছে বটে সে মোর ঘুঘুডাঙায়—আম বাগানের ধারে। চল মোর সঙ্গে। ঘর মোর শূন্য পড়ে আছে।'

উষ্ণ হৃদয়গুলি ঘিরে ধরেছে ছেলেটাকে—সবাই এসে হাত ধরেছে ওর। যেন যে কেউ ওকে জড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে বুকে—কোথায় কোন ঘরে—কোন স্বপ্নে। যা ছড়ানো আছে এই কাঁকর মাটির দেশ থেকে নোনা মাটির সাগর ঘেঁষা দেশ পর্যন্ত। তার জাত নেই—তার ধর্ম নেই—দেয়াল নেই। ছেলেটাকে সবাই ঘিরে ধরে যেন বলছে—

কিছুই হারায়নি—কিছুই খোয়া যায়নি তোর, না মানুষ-জন, না তোর মাঠ-জংগলের স্বপ্ন। এই রাঙা মাটির সীমা থেকে নোনা মাটির

দেশ সাগরের ধার পর্যন্ত—ঘর আছে তোর, আছে বাপ-মা, বোন-বেটি, ভাই-বন্ধু—যা চাস! চল মোর সঙ্গে।

ভোরের সুতীক্ষ্ণ প্রহারে অন্ধকার তখন কাঁপছে। সেই দ্রুত পরিবর্তমান অন্ধকারে চোখ মেলে দিয়ে আমি দেখছি গ্রাম-গ্রামান্তর, আমি দেখছি চিরকালের মহীয়ান মানব মানবীর গোষ্ঠীকে, থরথর ক'রে কাঁপছে তারা প্রদীপ্ত শিখার মতো—তাদের সংগ্রামের দুরন্ত ঝাপটায়। হয়তো কেউ কেউ নিভে গেছে। তবু দেখছি—সামনের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারকে জ্বালিয়ে তুলেছে তারা জীবন-দীপ্তিতে। সুদীর্ঘ বৎসরের বহু বঞ্চনায় জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের হাত ধরে দীর্ঘ বংশধারায় এসে দাঁড়িয়েছে সবেমাত্র কৈশোর অতিক্রান্ত মেয়েটি পর্যন্ত—নতুন স্বপ্নে, নতুন ঘরের মায়া রচনায়। চির বুভুক্ষিত আত্মার মতো যে কান্না ঝরে পড়ছে অশ্রান্ত ভাবে, বীভৎস—অসহ্য হয়ে উঠেছে এ মুসাফিরখানার অন্ধকার—তাকে ঘিরে ধরেছে ওরা, মুখর ক'রে তুলেছে নতুন আশ্বাসে, নতুন বিশ্বাস আর সান্ত্বনায়।

আমি দেখছি—জটিল ধাঁধার মতো নিবিড় এ অন্ধকারে আমি চেয়ে আছি—অলিখিত নতুন সেই এক মহাকাব্যের মানুষগুলির দিকে—জীবন যেখানে পূর্ণতর হয়ে উঠেছে অঢেল সুখ আর অগাধ শান্তিতে।

বেটা

গাড়ী আসবার কয়েক মিনিট আগে স্টেশনটা জমজমাট। মুসাফিরখানা আর প্লাটফর্মে প্যাসেঞ্জারের ভীড়। তার মধ্যে আছে ব্যবসায়ী, ফড়ে, ভদ্রলোক, অফিসার, দেহাতী মানুষ। মুসাফিরখানার এক কোণায় মুচি ধরিছনের সামনে কয়েকজোড়া ছেঁড়াজুতো। কোনটায় পেরেক বসবে, কোনোটা সেলাই মেরামতীর কাজ। আধবুড়ো লোকটা একভাবে মাথা নিচু ক'রে কাজ ক'রে যায়। গাড়ী আসবার সময় যতো ঘনিয়ে আসে ততোই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে প্যাসেঞ্জাররা। তাগাদা বাড়ে। ধরিছনের নিপুণ হাত চলে ততো দ্রুত। সেলাই মেরামত সে নিজে করে। পালিসের কাজ থাকলে হাঁক দেয় :

'ফ্যালা !'

ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট পরা বছর আষ্টেকের ছেলেটা ছুটে আসে সামনে, 'চাচা !'

ধরিছন কাজ করতে করতে মুখ না তুলেই বলে শুধু, 'পালিস।'

ফ্যালা লেগে যায় জুতো পালিসে।

তারপর গাড়ী এসে দাঁড়ালে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় যাত্রীদের মধ্যে। সেই ভীড়ের ভেতর থেকে হাঁক আসে আবার :

'ফ্যালা !'

'চাচা !' ফ্যালা ছোটে হাঁক লক্ষ্য ক'রে।

নীল কোর্তা-পরা ঘন্টি-ম্যান চৈতন্য গম্ভীর চাপা গলায় বলে, 'মোট আছে বাবুর। আগলে দাঁড়া—ভাগুচাচা আসছে।'

ভাগু তখন হয়তো গাড়ীতে অন্য কারুর মোট তুলতে ব্যস্ত। গাড়ী থেকে নামলো যারা তাদের মোট থাকলে পাহারা দেয় ফ্যালা আর চৈতন্য। ভাগু এসে সেগুলো একে একে তুলবে মোটর বাসে।

দেহাতী মানুষের হাঁক ডাক, মোটরের হর্ন, গোরুরগাড়ীর গাড়োয়ানদের দর কষাকষি—সবটা মিলে একটা জড়ানো হাল্লা। এর মধ্যে তারির করুণ কণ্ঠ কাৎরাতে থাকে মুসাফিরখানা থেকে ট্রেনের জানালায় জানালায়:

'অনাথা গো বাবু—মোর জমিন, গোরু, আপনজন সব কুথায় গেল গো বাবু ··· হায় চাষী গিরস্তের বৌ' ···

মাত্র কয়েক মিনিটের দুরন্তগতি হাল্লা। তারপর গাড়ী চলে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলেনী ইস্‌টিশান তার চারদিকের হা-হা করা পোড়া প্রান্তরের শামিল। মালপত্রের আমদানী-রফতানী, জনসমাগম—সব আছে, সবটা তরল চঞ্চল অস্থায়ী। স্থায়ী শুধু বেলেনী ইস্‌টিশানের সাড়ে চারটে মানুষ—বালক ফ্যালা, তিনটে পুরুষ আর একটা মেয়েলোক তারি।

গাড়ী চলে গেলে সবাই বেকার। সাড়ে চারটে মানুষ জটলা করে মুচি ধরিছনের ছেঁড়া চামড়ার ঝুলির সামনে। অপেক্ষা করে আবার একটি গাড়ীর।

সেদিন বিকেলের গাড়ী চলে যাওয়ার পর যখন স্টেশন খালি হয়ে গেল তখনও ধরিছনকে দেখা যায়—একভাবে মুখ নিচু ক'রে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

চৈতন্য হেসে বললো, 'ইস্—আজ মিস্তিরির বহুৎ কাম মালুম হচ্ছে?'—

ধরিছন কাজ করতে করতে জবাব দিলে, 'একঠো গাঁওলি দালাল—শহরে

গেছে, শালা দিয়ে গেছে শুধু দু-পাটি শুকতল্লা। দেখো। ই মেরামত করতে হবে। ফিরে এসে লেবে।'

'তো আজ বহুৎ মুনাফা মিস্তিরি।'

'গাঁওলি দালাল পয়সা দিবে জাদা? হায় হে কোম্পানী!'

চৈতন্যকে ডাকে সবাই কোম্পানী ব'লে—বোধ হয়. সে রেল কোম্পানীর কাজ করে, তাই।

এমন সময় ভাগুরাম এসে দাঁড়ালো। গায়ে বেঢপ ঝুল একটা লম্বা কোট—বোধ হয় কবে কোন স্টেশন মাস্টারের দেওয়া। কালি ময়লা ঝুল হয়ে গেছে কোটটা—ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে এখানে ওখানে। পরনে হাফপ্যাণ্ট—কিন্তু সেটা এই বেঢপ-ঝুল কোটের অন্তরালে কোথায় যে ঢাকা পড়ে গেছে, লোকটাকে হঠাৎ দেখে মনে হয় ল্যাংটো। ওর সমস্ত চেহারায় একটা খ্যাপাটে বেপরোয়া ভাব মেশানো—আধবুড়ো চৈতন্য ও ধরিছনের চেয়ে বয়সও ওর কম। যৌবনের শেষ জেল্লা এখনও ওর চোখে মুখে লেগে আছে। সে এসে পাশ ঘেঁষে বসলো তারির। তারি একটা গালাগাল দিয়ে সরে বসলো একটু। চৈতন্য হাসলো।

'মুয়ে আগুন।' তারি ফোঁস ক'রে উঠলো, 'একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়ছে দ্যাকো না!'

ভাগু বললে, 'আহা, গোসা হৈল তারি।'

'আহা রে, মুখ পোড়াকে সোহাগ ঢেলে দেবে।'

গোধূলির প্রান্তর পার হয়ে তখন সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে একটু একটু ক'রে। এখন ওদের সারা দিনের উপার্জন ভাগাভাগির সময়। চৈতন্য বাজে মস্করা জোর ক'রে ঠেলে দিয়ে বললে, 'ছোড় দোস্ত—কে কত কামালে।'

ভাগু একটা সিকি ধরে দিয়ে বললে, 'লাও কোম্পানী—মোর ষোলো মোট। ষোলো পইসা—এক সিকি, বাস্।'

চৈতন্য গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'উঁহুঁ—বিশ মোট।'

'তুমি গিন্‌তি করেছে ?'

'তবে ঝুট বলছি ?'

ভাগু হি-হি ক'রে হাসতে হাসতে বললো, 'পরখ করছিলাম—কোম্পানী ঠিক গিন্‌তি করে কিনা।'

'তোম শালা বহুৎ চিটিংবাজ হ্যায়। রোজ গোলমাল করবে। আমি দুসরা কুলি ঠিক করবো। কত লোক পায়ে ধরছে। তবু তোর জন্যে তাদের আমি ভিড়তে দিই না!'

ভাগু আরও একটা আনি ধরে দিয়ে বললে, 'লাও কোম্পানী। মাফ কিজিয়ে।' বলেই চৈতন্যের একটা পা চেপে ধরলে ঝপ্‌ ক'রে।

ধরিছনও একটি সিকি ধরে দিয়ে ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বললে, 'মোর ষোল জোড়া হয়েছে কোম্পানী। দালালের জুতোর দাম পাইনি—বাকী রইলো। শালার মোটর আসবার সময় হলো—তো মোর কাম শেষ হলো নি। চোখে দেখতে পাচ্ছি না।'

জুতোতে জোড়া-প্রতি এক পয়সা, মোট প্রতিও এক পয়সা—চালাও রেটের দালালি। চৈতন্যের উপরি রোজগার।

চৈতন্য বললে, 'আমি আলো জেলে দিচ্ছি।—বাস আসবার সময়ও হলো মিস্ত্রিরি—জলদি হাত চালাও।'

চৈতন্য মুসাফিরখানার আলো জ্বালবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

ভাগুরাম বললে, 'পালিস-টালিস থাকলে দাও মিস্ত্রিরি—করে দিই।'

একপাটি মেরামতী জুতো এগিয়ে দিয়ে ধরিছন বললে, 'করো ভেইয়া। শালা এসে পড়লে চিল্লাবে।'

ভাগু জুতো পালিস করতে লাগলো।

একপাশে বসে আছে তারি, হয়তো আর একটি গাড়ী আসবার অপেক্ষা

করছে। তার উপার্জনের শুধু কোনো দালালি কমিশন নেই। চৈতন্য রেহাই দিয়েছে তাকে—অন্য কোনো ভিখিরীকে সে ভিড়তেও দেয় না স্টেশনের ভেতরে। তারি বসে আছে দুরের ডিসটেণ্ট সিগন্যালের দিকে চেয়ে—একটা পাতলা অন্ধকারের পর্দা তাকে ঘিরে ঘন ঘনতর হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে—একটি নারীদেহের রহস্যময়তা গভীর হচ্ছে ক্রমশ। হাঁটু মুড়ে বসে আছে সে—এখন বোঝা যাচ্ছে না বয়স তার বাইশ, বত্রিশ না বিয়াল্লিশ। বাঙালী মেয়ের আপাদমস্তক শাড়ী পরার ঢঙে কড়া আলোতেও অবিশ্যি বয়সটা ধরা যায় না কোনদিন।

ভাগু জুতো পালিস করতে করতে আড়চোখে কয়েকবার দেখলো। তারিকে ডাকলো, 'শুনো—এ তারি!'

তারি একভাবে বসে রইলো—ঘুরেও তাকালে না।

ফের বললে ভাগু, 'আহা—গোসা হৈল।'

তারও কোনো সাড়া এলো না।

ভাগু গলা নামিয়ে ধরিছনকে বললে, 'আজ বিলাতী খাবে মিস্তিরি?'

'বিলাতী?'

'হাঁ, আজ বহুৎ খুশ খবর মিস্তিরি। ফিন লড়াই লাগ গিয়া।'

বাবু ভায়াদের আলোচনা থেকে সংগৃহীত খবর। ভাগুরাম শোনা তক্ উত্তেজিত। আবার জমে যাবে মরা এই বেলেনী ইস্টিশান!—

'অব্ লাল বন যাও মিস্তিরি—ফুর্তি করো।' ভাগুরাম তুড়ি দিয়ে উঠলো।

এমন সময় চৈতন্য আলো জ্বালতে এলো।

ভাগু বললে, 'কি মিস্তিরি খাবে?'

ধরিছন বললে, 'কোম্পানীকে বল।'

'কোম্পানী, খাবে আজ বিলাতী? তো বলো—চলে যাই জংশন ইস্টিশানে

এই গাড়ীতে?' ভাগু পুরো খুশ-খবরটা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো চৈতন্যের জবাবের জন্যে।

চৈতন্য আলো জ্বালতে জ্বালতে বললে, 'যা চলে—বহুদিন বিলাতী খাইনি।'

'বাস।' ভাগু হঠাৎ একটা ডিগবাজী খেয়ে বললে, 'কোম্পানী হুকুম দে দিয়া।' তারপর হঠাৎ বোধ হয় তার তারির কথা মনে পড়ে গেল। তারির পেছনে গিয়ে ফের বললে, 'ওহ্‌হো—তারি বড় গোসা হৈল।'—

চৈতন্য হাসতে হাসতে বললে, 'তুই শালা ওর পেছনে বড্ড লাগিস। জুতোর পালিসটা করে দিবি তো দে—বাস এসে পড়বে এখুনি।'

ভাগু ফের পালিস নিয়ে বসলো।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলো ফ্যালা। আসবার সঙ্গে সঙ্গে তারি তাকে চোখের ইসারা ক'রে ডেকে নিল কাছে—কি যেন বললো ফিস্ ফিস্ ক'রে। তারপরেই ফ্যালা এসে দাঁড়ালো ধরিছনের সামনে—যেখানে তিনটি পুরুষ বসেছে জটলা ক'রে!

ফ্যালা বললে, 'মোর পয়সা সবাই দিয়ে দাও চাচা।'

চৈতন্য বললে, 'বাস—মোদের মহাজন এসে গেল, পয়সা দিয়ে দাও সব।' বলে নীল কোর্তার পকেট থেকে একটা দু'আনি বার করে দিলে, 'লাও মহাজন।'

ধরিছন সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে তুলতে বললে, 'আমি তো আজ ওকে পয়সা দেবো না। তখন বললাম, দে পালিসটা করে—তো ও ছুটে চলে গেল। বললাম ওকে, কাম শিখে লে।'—

ফ্যালা বললে, 'শিখবো চাচা—ঠিক শিখবো কাল থেকে। এখন মোর পয়সা দিয়ে দে। না হলে এখুনি তোরা সব মদ খেয়ে খরচা করে ফেলবি।'

'আরিব্বাপ।' ধরিছন হাসতে হাসতে একটি দু'আনি পকেট হাতড়ে বের করে দিয়ে বললে, 'বহুৎ হুঁসিয়ার মহাজন! লে বেটা লে—তোর পয়সা।'

ভাগু কিন্তু মুখ গোমড়া করে এক ভাবে জুতো পালিস ক'রে যাচ্ছে। ফ্যালা তার দিকে চেয়ে বললে, 'চাচা—তোমার পয়সা ?'—

ভাগু ঝাঁকরে উঠলো, 'শালা সাতজন্মের ভাইপো আমার রে! যা ভাগ —আজ এক পয়সা দেবো না।'

'বাঃ, আমার পয়সা! রোজ দাও—আজ দেবে না কেন ?' ফ্যালার সুর আব্দারের।

'ভাগ শালা। আট বচ্ছর তো দিলাম—আবার কি!' ভাগু দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো।

'আর সব চাচারা যে দিলে!'—

'দিলে তো দিলে। আমি আর দেবো না।' ভাগু তেরিয়া হয়ে জবাব দিল।

ফ্যালা মার খাওয়া মুখে চেয়ে রইলো ভাগুর দিকে কিছুক্ষণ। তারপর তাকালো চৈতন্যের দিকে—যেন বিচারের আশায়। ধরিছন একমনে ফোঁড় তুলছে মুখ নিচু ক'রে।

কেউ আর কোনো কথা বলে না। ভাগু ক্ষেপলে পয়সা দেবে না—এ ধরিছনও জানে, চৈতন্যও জানে। আর লোকটা হঠাৎ মাঝে মাঝে তেরিয়া হয়ে ওঠে এই রকম। গোঁয়ার আছে—বংসের গোঁ। তবু আট বছরের প্রতিদিনই সে এই ক্ষুদে মহাজনের চাঁদা জুগিয়েছে—দিনের রোজগার থেকে দিয়েছে তিন জনেই সেই সেদিন থেকে, আট বছর আগে যেদিন একটি শিশু জন্মেছিল মুসাফিরখানার এক কোণে।

তখন বেলেনী স্টেশন ছিল জমজমাট। যুদ্ধের সময়। কাছাকাছি হয়েছিল হাওয়াই ঘাঁটি, সেনাবারিক। ক্ষুধার্ত বিপর্যস্ত গ্রাম-জীবন ভেঙে ভীড় করে এসেছিল নানান জাতের নরনারী। তরপর যুদ্ধের সে তরঙ্গ সরে গেল একদিন, প্রায় পড়ো প্রান্তরের শামিল হয়ে গেল আবার বেলেনী স্টেশন।

আর তাতে তরঙ্গবাহিত জঞ্জালের মতো ঠেকে থেকে গেল এই কটা লোক। তাদেরই মধ্যে বেঁচে উঠেছিল একটি শিশু। সে আজ বড় হয়েছে। ধরিছনের কাজ ক'রে দেয়—একা ভাগুরাম যখন সকলের মোট আগলাতে পারে না তখন সে পাহারা দিয়ে সাহায্য করে।

ফ্যালা ভাগুরামের দিকে তাকিয়েছিল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। ভাগু ফের একবার ঝাকরে উঠলো, 'এবার মোট বয়ে রোজগার করবি—হাঁ।'

ফ্যালা চম্‌কে উঠে দু-পা পেছিয়ে গেল। তাকালো পিট পিট ক'রে। চোখে এবার তার শয়তানী খেলছে। ফট্ ক'রে বলে বসলে, 'মোট বইবো কেন? উ তো বেইজ্জতী কাম। মোকে রেলের কাম শিখাবে কোম্পানী চাচা।'

হঠাৎ খেপে উঠলো ভাগুরাম। তেড়ে গেল, 'ভাগ বে শালা।'—

ফ্যালা গিয়ে লুকালো একেবারে তারির কোলের মধ্যে। ধরিছন আর চৈতন্য হেসে উঠলো। ভাগু আবার জুতো পালিস করতে লাগলো।

তারি খ্যান-খ্যান ক'রে গাল পাড়তে লাগলো, 'মোট বয়ে মরুক যার জমিন ঘর-দোর নাই, বলদ-গোরু নাই—হাঘরে পোড়া কপাল। মোট বয়ে বয়ে মরুক যার গাছতলায় ডেরা—কপালে হা-অন্ন। মোট বয়ে মরুক যার'—

তারি বকর বকর ক'রে চললো এক ভাবে।

ভাগু ফের বলে উঠলো, 'আচ্‌ছা গোসা হৈল তারি, গোসা হৈল জমিন-ঘর বলদকা বাত।'—

হাসে চৈতন্য আর ধরিছন।

তারি ঝাম্‌টা দিয়ে বললো, 'ছিল তো রে, তোর মুয়ে আগুন।'—

ভাগু শুধু বললে, 'হাঁ—ছিল।'

ছিল। সে অতীতের কথা—আট বছর আগের কথা। তারিই সে কথা তোলে কখনো কখনো, চাষী-বউয়ের মান মর্যাদার কথা। ওরা হাসে।

কাজের মধ্যে ওদের মান-মর্যাদার বালাই নেই। পরস্পরকে ওরা সাহায্য করে। এমনি করে আট বছর কেটে গেছে। কে কোথা থেকে এসেছিল, কেমন ক'রে ঠেকে গেল এখানে—সে কথা সারা দিনের জুতো সেলাই, মোট বওয়া আর ঘন্টি দেওয়ার মধ্যে মনেও পড়ে না কারুর। শুধু সন্ধ্যের পর শেষ ট্রেন ছেড়ে গেলে মদ খায় তিন জনে, তারপর মাতলামী সুরু করে ভাগু। সারাদিন সে মোট বয়, ধরিছনের জুতো মেরামতের কাজেও সাহায্য করে। কিন্তু পেটে মদ পড়লেই খামাখা ধমকাতে শুরু ক'রে সে—বিশেষ করে ধরিছনকে :

'হাম বাহ্মণ হ্যায়—বাহ্মণ! আর তোম?—চামার।'

ধরিছন তখনও খুব বিনীত—হাতজোড় করে বসে থাকে ভাগুর আস্ফালনের সামনে। আর চৈতন্য বলে তার ঘর-সংসারের কথা। কোথায় পড়ে আছে সব! ছেড়ে দেবে—ই কাম, ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে সে কোনো একদিন দেশে; জীবন বড় ফাঁকা লাগে। শুনতে শুনতে আধবুড়ো ধরিছন ফোঁপাতে সুরু করে :

'কোই নেই হ্যায়—হামারা কোই নেই হ্যায় ভেইয়া। জরু মর গেয়া—বহুড়ী ভাগ গেয়া—লেড়কা খতম হো গেয়া লড়াই মে। কোই নেহি'—

অন্ধকারে, মাতলামিতে হঠাৎ কবেকার পুরানো জীবন যেন প্রাণ পায় ওদের। ফ্যালা হেসে গড়াগড়ি যায়। মদ খেতে বসে ফ্যালাকে দেয় ওরা তেলেভাজার চাটের ভাগ। কোনো দিন চৈতন্য ফ্যালাকে কোলে ক'রে বক বক করে—ফ্যালাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তু হামার লেড়কা।'

আর ভাগু চিতপাত হয়ে বিড় বিড় করে, 'তারি পিয়ারী!'

তারি ঝামটা দিয়ে ওঠে হয়তো, 'মুয়ে নুড়ো জেলে দেবো মুখপোড়া?'

'আহ্‌হা—তারি গোসা হৈল।' ভাগুরাম গোঙিয়ে গোঙিয়ে বলে, 'হামার ভি জমিন গোরু বলদ ছিল তারি, যজমান ছিল—সব খতম।'

'চুবো মুখপোড়া !'

এই অনড় আবর্জনার মত সাড়ে চারটে জীবের জীবনে একদিন পরিবর্তন এলো। স্টেশন-মাস্টারকে ধরে ভাগু গ্যাং-এর একটা নোকরি জোগাড় ক'রে ফেললে। মাইল দশেক দূরে কোন এক স্টেশন থেকে ডবল লাইন পাতা হচ্ছে—বিস্তর কুলির দরকার। ভাগুর কাজ হয়ে গেল।

'রাম রাম কোম্পানী, রাম রাম মিস্তিরি।' ভাগুরাম বিদায় নিয়ে দাঁড়ালো একদিন প্লাটফর্মে—পেছনে তারি।

হাসি মুখে চৈতন্য এবং ধরিছন বিদায় দিল বটে কিন্তু মুস্কিল হলো ফ্যালাকে নিয়ে। সে যত ঝাঁপিয়ে পড়ে তারির আঁচল চেপে ধরতে যায়, ভাগু ততো তেড়ে যায় :

'যারে ঝাপট—শালা ভাগ।'

তারিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাগুরাম। ওদের শলা পরামর্শ ক'রে কখন মিল হয়ে গেছে। ফ্যালা গলা ফাটিয়ে চিল্লাতে থাকে :

'মাকে লিয়ে যাবে কেন! মোর মাকে'—

'শালার সাতজন্মের মা! ভাগ।'—ভাগু রুখে ছুটে গেল।

ফ্যালাও ক্ষেপে গেছে। কাঁকর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলো ভাগুর দিকে। টাঁই ক'রে লাগলো একটা ভাগুর কপালে। ভাগু ছুটে গেল ফ্যালার দিকে। বালক কিন্তু ভয় পেল না। ভাগু তার গলা চেপে ধরতে যেতেই ভাগুর হাতে কামড়ে দিল ফ্যালা। বাচ্চাটা প্রাণপণ লড়াই করছে আত্মরক্ষার জন্যে—বার বার ছুটে যেতে চাইছে তারির দিকে। তারপর হঠাৎ একটা ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো গিয়ে দূরে। শেষ পর্যন্ত তাকে আটকে রাখলো চৈতন্য আর ধরিছন। রেল-গাড়ীতে উঠলো ভাগুরাম। পেছনে ফিরে দেখলো, তারি দাঁড়িয়ে আছে কেমন বোকার মতো। ভাগু ডাকলো :

'গাড়ী ছেড়ে দেবে—এ তারি !'

'এঁ্যা !' কেমন হকচকানো ভাবে তাকালো তারি চারদিকে। একটা নতুন অবস্থা তাকে যেন নির্বোধ ক'রে দিয়েছে হঠাৎ।

'উঠে আয় জলদি।'

তারি থমথমে মুখে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

আপ-এর গাড়ী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাউনের গাড়ী এসে হাজির। যাত্রীর হৈ-হাল্লা—জুতোর মেরামতী কাজ, ওদিকে লাইন ক্লিয়ার—ঘন্টি, এ সবের মধ্যে ধরিছন আর চৈতন্য বিব্রত। তাদের আর খেয়াল রইলো না—ফ্যালা কোথায় গেল। এ গাড়ীও যখন চলে গেল এবং সারা প্লাটফর্ম মুসাফির-খানা খালি হয়ে গেল তখন ফ্যালাকে তার মধ্যে দেখা গেল না কোথাও। আজ আবার একজোড়া ছেঁড়া জুতো সারাতে দিয়ে গেছে কে—ধরিছন তাই সেলাই করছে। চৈতন্য তার সামনের বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে নীরবে বিড়ি ফুঁকছে।

সূর্য তখন ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। সামনে গোধূলি। স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারের সামনে ইঁদারা। তার বাঁধানো উঁচুপাড়ের তলায় আত্মগোপন ক'রে বসে আছে ফ্যালা। ওর চোখে মুখে অভিমান জমাট বেঁধে আছে। হাঁক শুনেছে সে :

'ফ্যালা !'—চৈতন্যের ডাক।

'এ মহাজন !'—ধরিছনের ডাক।

ফ্যালা সাড়া দেয়নি। হাঁ-ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখেছে দূরে—দক্ষিণে : বড় সড়ক ধরে বহু দূরে ধান কলের চোঙ পার হয়ে যেতে যেতে—বাঁ দিকে আরও অনেক দূরে এক গাঁয়ে উঁচু উঁচু যে নারকেল গাছ, সেইখানে তাদের পানাদহ গ্রাম না ?—ঘর-দুয়ার গোরু জমিন ধানের গোলা ! হ্যাঁ —সেখানে সে গিয়ে বলবে, মা মরে গেছে।

সারা বিকেল পাত্তা নেই ফ্যালার—ইঁদারার উঁচু পাড়ের আড়ালে সে লুকিয়ে রইলো।

তার জন্যে গভীর উদ্বেগও ছিল না কিছু ধরিছন বা চৈতন্যের। এ লাইনে এই রকমই হয়—কাঁদে বাচ্চাগুলো কদিন। বাস্—তারপর ভুলে যায় সব।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে ধরিছন আর চৈতন্য গেছলো তাড়ি খেতে। ধান-কলের কাছে তাড়ির দোকান। তাড়ি খেয়ে ফেরবার মুখে সড়কের ওপরে দেখা ফ্যালার সঙ্গে।

'আহ্ রে মহাজন!' ধরিছন ধরে ফেললে ফ্যালাকে, 'কাঁহা যাবি বেটা?'

ফ্যালা ফুঁপিয়ে উঠলো, 'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোকে।'

চৈতন্য তার আর একটা হাত ধরলে। বললে, 'কোথায় যাবি বে—ই অন্ধকারে—একলা!—এ্যাঁ?'

'পানাদহ—মোদের গাঁ।' ফ্যালা ফুঁপিয়ে জবাব দিল।

'হাঁ হাঁ—তোদের গাঁ!' ধরিছন হেসে বললে, 'কে বললো তোকে সে কথা?'

'কেন—মার মুখে শুনেছি কত দিন।'

কতদিন শুনেছে সে গাঁয়ের কথা—সে গাঁ যেন চোখের সামনে ভাসছে। পা ছড়িয়ে তাকে কোলে বসিয়ে ঘুমোবার আগে কতদিন সেই গল্প করেছে তার মা।

চৈতন্য যেন রসিকতা করে বললে, 'তা তোর মা-টা কে বটে?'

ফ্যালা হাত ঝাঁকি দিয়ে বললে শুধু, 'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোকে। আমি চলে যাব।'

'আরে বেটা!' ধরিছন বললে, 'কে তোর মা—কোথায় তার গাঁ রে মহাজন! মা তোর মরে গেছে সেই আট বচ্ছর আগে তোকে জনম্ দিয়ে—কোথায় তার গাঁ না-জানি। হাঁ—তারি তোকে মানুষ করেছে, মোরা তোকে মানুষ করেছি।'

চৈতন্য বললে ওর হাতে মৃদু টান দিয়ে, 'চল বেটা চল!'

'কুথায় যাবি বেটা ই অন্ধকারে—পথ ভুল ক'রে কোথায় ঘুরবি তার ঠিক নাই।' ধরিছন ওর আর একটা হাত ধরে এগোলো।

বালকের ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত মানসে আবার একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। ফোঁপাতে থাকে সে। কি কথা বলে এরা? তারি তার মা নয়—তার মা মরে গেছে? ছোট পরিসর তার চেনা জগৎটা পলকে পলকে যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সেই ঝাপসা ফাঁকা পথ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আবার ফিরে এলো সে মুসাফিরখানায়।

তার শোবার ছোট চটখানি পাতা হলো আবার ধরিছনের চট ঘেঁষে। ধরিছন তাকে জোর ক'রে শুইয়ে দিয়ে বললে, 'ঘুম কর বেটা—ঘুম কর।'

মুসাফিরখানাটা আজ অনেক বেশী বড় আর ফাঁকা মনে হয় ধরিছনের কাছেই। তারি নেই। ভাগু নেই। তার কোলের কাছ ঘেঁষে ফোঁপাচ্ছে শুধু বাচ্চাটা। একটানা সেই ফোঁপানী শুনতে শুনতে সারা দিনের ক্লান্তির পাহাড় নেমে এলো তার চোখের ওপরে।

ভোরের পাঁচ নম্বর ডাউন ট্রেন প্লাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে সিটি দিচ্ছে ঘন ঘন। স্টেশন মাস্টার ছুটে বেরিয়ে এলো, চৈতন্য ছুটে গেল। ঘুম ভেঙে গেল ধরিছনের। চমকে উঠে বসে দেখলো সে—ফ্যালার চট খালি। ধরিছন চোখ মুছতে মুছতে উঁকি মারলো রেল-লাইনের দিকে। সেখানে তখন একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেছে।

এ্যাকসিডেণ্ট।

এ্যাংলো ড্রাইভার স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলো, 'এ লাইনে শেষ গাড়ী গেছে কখন?'

'রাত চারটে—মালগাড়ী, গুডস ট্রেন।'

এ্যাকসিডেণ্ট শেষ রাতের দিকেই হয়ে গেছে। রক্ত-প্রবাহ তখনও তাজা

—সজল। ধরিছনের কোলের কাছ থেকে কখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে পালিয়েছিল ফ্যালা, মন্থরগতি মালগাড়ীর বগীতে চড়ে যেতে চেয়েছিল তার মায়ের কাছে।

রেল-লাইন ধরে হেঁটে হেঁটে সেই ভীড়ের পেছনে এমন সময় এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে—চোখে মুখে তার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসার ক্লান্তি। ভীড়ের মধ্যে পাংশু মুখে সে একবার উঁকি মেরে দেখলো—তারপর আর্তনাদ ক'রে উঠলো :

'ওরে ফ্যালারে—আমি যে তোর জন্মে পালিয়ে এলম রে ?'—

এ্যাংলো ড্রাইভার স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলো, 'ও কে—মা ?'

'হ্যাঁ। ভিখারী।'

চৈতন্যের ঠোঁট কাঁপছে। বললে, 'না হুজুর—ওর মা মরে গেছে আট বছর আগে। সেই যুদ্ধের সময়ে।'

ধরিছন তখন ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। ঝুঁকে হাত বুলোচ্ছে ফ্যালার কাটা ধড়টায়, 'বেটা ··· বেটা!'

'ই কোন হ্যায়—বাপ ?' এ্যাংলো ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো।

স্টেশন মাস্টার বললো, 'হবে স্যার—এদের মধ্যে হবে কেউ একটা।'

চৈতন্য আবার প্রতিবাদ ক'রে উঠলো, 'না হুজুর—ওর বাপ ছিল একটা সাহেব মিলিটারী।'

'তব তোম লোগ রোতা কাহে ?'—

রোতা কাহে—কেন কাঁদে ? মানুষগুলো কাঁদে কেন! কেউ উত্তর দিলে না। বোবা পশুর মতো গোঙিয়ে মরছে তারিও, ধরিছন আর চৈতন্যের চোখে জল।

নামগোত্রহীন একটা দেহ নিয়ে কান্না—এ্যাংলো ড্রাইভার ধমক দিলে :

'জল্‌দি সাফ করো লাইন।'—

চৈতন্ত আর ধরিছন বেওয়ারিশ কাটা বাচ্চা ধড়টাকে সরিয়ে নিল লাইনের ওপর থেকে সযত্নে—সস্নেহে।

গাড়ী চলে গেল।

দীর্ঘ আট বছরের মধ্যে একটি নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটে গেল সেদিন সন্ধ্যের পরে বেলেনী স্টেশনের মুসাফিরখানায়। পোড়ো প্রান্তরের দিক-চিহ্নহীন গাঢ় অন্ধকারে জমাট বেঁধে গেল সেদিন স্তব্ধ বেলেনী স্টেশন। এতটুকু সাড়াশব্দ নেই কোথাও—নেই মাতলামীও। ওরা আজ কেউ মদ ছোঁয়নি। তারির চটটা পাড়া হয়েছে আবার এক কোণায়। তার কোল ঘেঁষে পাতা হয়নি শুধু আর একটা ছোট চট। সেটা গুটানো।

মলিন আলোয় মনে হয়—ওরা যেন মরে গেছে। স্টেশনটাও। ওর কয়েকটা বাসিন্দা, ওদের জীবন—সবটার ওপরে যেন স্তব্ধ গাঢ় অন্ধকারের ভেতর থেকে শূন্য চোখে চেয়ে আছে সেই আট বছর আগের ধ্বংস—যেদিন এই রকম এক অন্ধকারে জন্ম হয়েছিল একটি বেওয়ারিশ বাচ্চার।

বহিন

রেল-কলোনীর শহর—এ লাইনের বড় জংশন স্টেশন। স্টেশন ঘেঁষে সওয়া মাইল ঘিরে বাজার বেসাতি, কেরানি কোয়ার্টার আর কুলি-লাইন। মাদ্রাজী, সাঁওতাল, বাঙালী আর আদ্রা-গোমো অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের কলকণ্ঠে ভন্‌ভন্‌ করে ছোট জায়গাটুকু। স্টেশন ইয়ার্ডের পাশ ঘেঁষে কিছুটা রাস্তা পিচ ঢালা—সেটা হলো সদর। তার পাশে পাশে বড়সাহেব আর বড়বাবুদের কোয়ার্টার—ঝকঝকে, তকতকে, একঘেয়ে। বাকীটা মফঃস্বল। খোয়া ওঠা কাদা প্যাচপ্যাচে রাস্তা, ভাটিখানার গোলমাল গালাগালি আর খোলা নর্দমার গন্ধ—সবটা মিলে বিচিত্র। মুহূর্তে মুহূর্তে যেন রং বদলে যায়। রূপ বদলে যায় মানুষগুলোর—রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে জায়গাটার। কাজিয়া, মারামারি, হাল্লা আর হাসি।

হৃদয় দত্ত এ জায়গা ছেড়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। বলে, 'নরককুণ্ড।'

'কেন?' অনিলা বুঝতে পারে না।

'কেন! বুঝবে—দু-দিন সবুর কর। পচে পচে মরবে। হাঁপিয়ে উঠবে।'

কিন্তু অনিলার ভালো লাগে। নতুন জায়গা দেখার আনন্দ তার। পুবে যাও—নদী ঘেঁষে সমতল ভূমি, সবুজের সমারোহ সুরু হলো ছলছলিয়ে। আর পশ্চিমে তৃণহীন পাথুরে প্রান্তর—ধূ-ধূ করছে। চড়াই উৎরাই লাল-

মাটির দেশ। ছোটনাগপুরের পাহাড়ী সীমান্ত এসে শেষ হয়েছে দুরন্ত প্রান্তরের ওপারে। ভালো লাগছে অনিলার। নতুন বিয়ের পর চলে এসেছে স্বামীর সঙ্গে কর্মস্থলে। স্বামী-স্ত্রীর ছোট সংসার—ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই। নতুন দেশ আর মনোবিলাসের প্রচুর অবসর—এতেই খুশি অনিলা। হৃদয়ের উচ্চ অভিলাষের সে ধার ধারে না। দূরে কোথাও কোনোদিন মাদল বাজলে তো আর কথা নেই। বলবে :

'সেই শালবনে বোধহয়।'

ঘটনাটা আর কিছু নয়, পশ্চিমের প্রান্তরে হৃদয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একদিন মাদলের শব্দ শুনেছিল অনিলা।

হৃদয় দূরের ঝাপসা শালবনের রেখার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, 'ওদিকে সাঁওতালদের গাঁ।'

'নিয়ে যাবে?'

'সে যে অনেক দূর! তা ছাড়া দেখবে আর কি। সাঁওতালও দেখেছ আশেপাশে—আর মাদলের আওয়াজও শুনেছ পাড়ার তাড়িখানায়। সেই রকমই আর কি।'

অনিলা কিন্তু মনে মনে তা মানতে পারেনি। দূরে শালবনের মাদল যেন অন্য রকম। শহর ছাড়িয়ে দূরে কোনোদিন তাই মাদল বাজলে অনিলা বলে—'সেই শালবনে বোধহয়।'

সেই রকম মাদল বাজে আজ। রাত অনেক হয়েছে, থেমে গেছে ছোট শহরটুকুর গোলমাল হট্টগোল, যাত্রী ওঠা-নামার কোলাহল। বহুদূর থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসে নিস্তব্ধতায় তরঙ্গ তুলে তুলে।

অনিলা বললো, 'সেই শালবনে।'—

'তোমার সব সেই শালবনে।' হৃদয় ঠাট্টা করে বললো।

'ওই শোন না—পশ্চিম দিকে।'—

'আমি ভাবছি পুবের কথা।' হৃদয় হেসে বললো, 'কলকাতায় বদলী হলে কেমন হয় বল দেখি?'

'যাবে কলকাতা?'

'চেষ্টা করছি। ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে একবার ধরতে পারলে হয়ে যায়। মায় প্রমোশন পর্যন্ত।'

'এখানে কিন্তু বেশ আছি।'

এবার জ্বলে উঠলো হৃদয়, 'কি আছে এখানে! পচা এঁদো শহর —কুলি-লাইন, আর মাতাল। বাস্।'—

আর আছে সেই পরিবেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দারিদ্র্য ও জীবনের হাজারো বিকৃতি। ঘেরাটোপের জীবনে চারদিকে ঠোক্কর খেতে খেতে আরও কোণ খোঁজে মানুষগুলো। পরিধি সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হয়ে আসে। সাহেবদের খোসামুদি, রেষারেষি, চুকলি—স্টাফ থেকে স্টাফে, লাইন থেকে লাইনে। তার চেয়ে হৃদয়ের ধ্যান অনেক বড়।

অনিলা বোঝে না। সে চুপ ক'রে স্বামীর বুক ঘেঁষে শুয়ে শুয়ে শোনে কান খাড়া ক'রে বহু দূর থেকে ভেসে আসা মাদলের শব্দ।

অনেক দূরে এক জায়গায় মাদলের আওয়াজ তরঙ্গিত হ'য়ে উঠছে তখন দমকে দমকে। তৃণহীন পাথুরে প্রান্তরের স্তব্ধতা কেঁপে কেঁপে উঠছে তালে তালে। পুবে কাঁসাই নদীর বিস্তীর্ণ বালুচর আর আনিকাট-বাঁধের পাথর-চাপা বদ্ধ জলা; পশ্চিমে খাঁ-খাঁ করছে লাল মাটির প্রান্তর। তারা ভরা আকাশের মিনমিনে আলোয় সবটা যেন গুম হয়ে আছে অসহ্য রিক্ততায়, বঞ্চনায়। এর একান্তে শুধু ডবল লাইনের রেলওয়ে ব্রিজটা অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আছে ফিকে অন্ধকারে। উঁচু রেলওয়ে বাঁধের নিচে কোম্পানীর ছোট ছোট তাঁবু—কুলি কামিনের আস্তানা, যেন হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেগুলো। আশপাশে ছড়ানো ছত্রখান লোহা-লক্কড় কাঁকর-পাথর,

পাইপ আর পিচের পিপে। সেখানে অন্ধকার জমাট—উঁচু বাঁধ আর ব্রিজের কালো ছায়া মহা আক্রোশে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেখানে। মাদলের শব্দ উথলে উঠছে সেই অন্ধকার থেকে—ছড়িয়ে পড়ছে শুব্ধ বায়ুমণ্ডলে। আর হাঁড়িয়ার নেশায় মত্ত এলোমেলো বানানো গান :

পোলটা করলম। লদীটা বাঁধলম।
তারপর হাঁড়িয়া খেলম পেটভরে।
এবার ফিরে যাব আমার রাজার * কাছে।
একজন শুধু মর‍্যো গেল।
আমরা পোলটা করলম।

মিহি ও মোটা গলার বন্য ঐকতান আর মাদলের হিন্দোলিত গম্‌গম্‌। জমে উঠেছে সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষের নাচগান। আধ-বুড়ো কাঁধ-মোটা একটা সাঁওতাল পচাইয়ের কলসী ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সকলের মাঝখানে। সেই হলো মূল গায়েন। পচাইয়ের লোভে ওদের দলে এসে ভিড়েছে আদ্রা-গোমো অঞ্চলের কিছু মজুরও। তারা নাচ গানের মধ্যে নেই—আছে পচাইয়ে। গানের মাঝে মাঝে শুধু ঝাঁঝিয়ে উঠছে তাদের হল্লুতে চিৎকার।

বাধা পড়লো হঠাৎ অতর্কিতে।

গোমো অঞ্চলের ঢেঙা লোক একটা ছুটে গিয়ে চেপে ধরলো একটি সাঁওতাল মেয়েকে। হঠাৎ ঝটাপটি লেগে যায় সেখানে। মেয়েটা গান ছেড়ে চেঁচাতে সুরু করেছে আর বেপরোয়া চালিয়ে যাচ্ছে কিল চড় লাথি। কিন্তু লোকটা তবু ছাড়বে না যেন কিছুতেই। ক্ষেপে গেছে, ঠেসে ধরেছে মাটিতে ফেলে।

নাচ থেমে গেল। গান থেমে গেল। সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষরা ছুটে এলো সেদিকে হৈ-হৈ করে। টেনে ছাড়িয়ে দিলে দু-জনকে।

---

* প্রিয়।

'লিয়ে যা তোদের জেতের লোকটাকে।' আধবুড়ো মূল গায়েন বল্লো আদ্রা-গোমোর লোকগুলোকে, 'ডেক্যে আনলম। হাঁড়িয়া দিলাম। শেষে জেত লিবি? যা চল্যে যা, ভালো লোক লয় বটে তোরা হে।'—

ভালো নয়।

'ঠিক বাৎ—মারডালো শালা লছমনকো।'

'ঠিক বাৎ।'

আদ্রা-গোমোর লোকগুলো রুখে উঠেছে সবাই, 'বেইমান!'

নেশার আমেজে ব্যাপারটা এগোয় না আর বেশী দূর। লছমনকে মজলিস থেকে শুধু বের করে দিয়ে ভাঙা দল আবার একত্রিত হয় ধীরে ধীরে।

এই গোলমালের সুযোগে আর একটি মেয়ে বেরিয়ে যায় সবার অলক্ষ্যে। নাচতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে সে—পা কেঁপে উঠেছে। পেটের মধ্যে যেন নড়ে উঠেছে কে হঠাৎ।

নড়ে উঠেছে মেট কিশোরীলালের বাচ্চা।

কেমন যেন ঘাবড়ে গেল সল্‌মা। এক ফাঁকে হুল্লোড়ের আসর থেকে বেরিয়ে সল্‌মা দাঁড়ালো এসে উঁচু রেল বাঁধের নীচে স্তব্ধ হয়ে। বিব্রত, বিভ্রান্ত।

দূর থেকে ভেসে আসছে অনেকগুলি মিহিমোটা গলার গান—জড়িয়ে জড়িয়ে ভেসে আসছে অর্থহীন নির্বোধ অন্তর্বেদনার মতো। শেষ হাঁড়িয়ার আসয়—শেষ উৎসব। কাল থেকে কাজ ছুটি, কতকগুলো বড় তাঁবু উঠে গেছে এর মধ্যে। চলে গেছে সায়েব-সুবো ইঞ্জিনীয়ার, মেট কিশোরীলাল পর্যন্ত। সাত আট মাস কাজের পর ব্রিজটা শেষ হয়ে গেল। আর কাজ নেই, বাকী বকেয়া পাওনা হিসেব মিটে গেছে। দল ভেঙে যাবে এবার। সকালে উঠে দেখ্‌বে সল্‌মা—কাচ্চা-বাচ্চা কোলে কাঁধে করে বোঁচকা-বুচকি হাঁড়ি-কুঁড়ি ভারে ভারে সাজিয়ে চলে যাচ্ছে তার জাতের মানুষরা সোজা পশ্চিমে,

রেল-লাইন ধরে ! যেতে যেতে মাঝপথে কারুর কাজ যদি জুটে যায় রেল লাইনে তবে থেকে যাবে সে। নইলে চলে যাবে। কিন্তু পেটে মেট কিশোরীলালের বাচ্চা নিয়ে সে যাবে কোথায় ? তার জাত চলে গেছে ইজ্জতের সঙ্গে সঙ্গে।

ব্রিজের ওপর দিয়ে একটা ট্রেন আসছে হুড়মুড় করে—আসছে যেন সমস্ত ভেঙে চুরে, মাদলের উত্তাল আওয়াজ আর অনেকগুলি কণ্ঠের মিলিত ঐকতানকে মাড়িয়ে পিষে। ওই হুড়মুড়ে শব্দের মাঝখানে সল্‌মার সমস্ত চেতনা থমকে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে—ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়।

ব্রিজ পার হয়ে ট্রেনটা ছুটে বেরিয়ে গেল পুবে। জনহীন শূন্য প্রান্তরের স্তব্ধতা ঘোর হয়ে এলো আবার। আর সেই অর্থহীন নির্বোধ অন্তর্বেদনার মতো খাপছাড়া ঐকতান :

—তারপর হাঁড়িয়া গেলম পেট ভরে।
এবার ফিরে যাব আমার রাজার কাছে।

রাজার কাছে ···

মহুয়া আর শালবন, পাথর ভাঙা রাঙা মাটির দেশ। কাচ্চা-বাচ্চা বউ নিয়ে ফিয়ে যাবে সবাই। শুধু সল্‌মা ফিরবে না—জাত দিল যে জামা জুতো পরা অন্য জাতের একটা 'মরদের' কাছে। ফিরবে না আরও একজন। সে মরে গেছে একদিন লোহা-লক্কড় চাপা পড়ে।

বুনো মেয়ের পাথর স্তব্ধ মুখ—চোখে নাই জলের রেশ। নিস্প্রভ আকাশের আলোয় ঝকমক করছে কাঁসাই নদীর বাঁধ বাঁধা বদ্ধ জলার মতো—ঘন কালো আর গভীর।

দল ভেঙে গেল পরের দিন ভোরে। সল্‌মা শুধু চলে এলো পুবে—সোজা রেল লাইন ধরে একা, বড় জংশন স্টেশনে।

সারা বাজার ঢুঁড়লো সল্‌মা—অলিগলি, মদের দোকান, ভাঁটিখানা।

কিশোরীলালের পাত্তা নেই কোথাও। ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টের অফিসের সামনে গিয়ে ঘাবড়ে গেছে সে—ফিরে এসেছে ভয়ে। তারপর খুঁজে বের ক'রেছে এস্টাব্লিশমেণ্ট ক্লার্ক হৃদয় দত্তের বাড়ী। আগেও কয়েকবার এসেছে সল্‌মা মেট কিশোরীলালের সঙ্গে এ শহরে। এসেছে, ফূর্তি করে ঘুরে বেড়িয়েছে বাজারের পথে পথে কাজ কামাই ক'রে। তবু রোজের টাকা পাইয়ে দিয়েছে কতদিন কিশোরীলাল। মদ খাইয়েছে সে—পচাই নয়, বোতলের মদ। তারপর রাত হলে টেনে নিয়ে গিয়েছে সাইডিংয়ে রাখা খালি মালগাড়ীর ভেতরে।

কিন্তু সে-কিশোরীলালের সন্ধান পেল না সে আজ কোথাও। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এসে বসেছে শেষ পর্যন্ত হৃদয় দত্তের বাড়ীর রোয়াকে। অনিলা বসিয়ে রেখেছে তাকে, আলাপ করেছে, জেনেছে সব।

··· হায় দূর শালবন ! ···

হৃদয় অফিস থেকে ফিরে এলে অনিলা বললো, 'একটা সাঁওতাল মেয়ে বসে আছে তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে !' হৃদয় জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ? কোথায় ?'

'রোয়াকে বসিয়ে রেখেছি।' অনিলা হেসে বললো, 'বড় বিপদে পড়েছে বেচারী। পেটে কার না কার ছেলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজারময়। ওকে কাজ জুটিয়ে দাও একটা।'

'নিজের কাজ কতদিন থাকে তার ঠিক নেই—ছাঁটাই ঝুলছে মাথার ওপরে! যতো সব অনাসৃষ্টি তোমার। কোথায় সে মাগী।'—বলে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল হৃদয়।

অনিলা ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাইরের রোয়াক থেকে ভেসে এলো স্বামীর দাঁত খিঁচোনি :

'এখানে কি ! যা ভাগ্।'

'একটা কাম করে দে বাবু।'

'কাম। কামের একেবারে ছড়াছড়ি!'

'তবে কি করবে রে বাবু—বলে দে। পোলের কামটা যে কাল শেষ হয়্যে গেল।'

'তা আমি কি করবো। কসবী গ্যাঙে চলে যা। উই পশ্চিমে।'

সল্‌মা তাকালো বোকা বোকা চোখ তুলে হৃদয়ের দিকে। কয়েক মুহূর্ত। হৃদয় ঘরে ঢুকে দরজা দিল। সল্‌মা আস্তে আস্তে নামলো হৃদয় দত্তের রোয়াক থেকে। মুখ মুছলো। ঘেমে গেছে হঠাৎ।

... কসবী গ্যাঙ।

পথে নেমে এগোলো স্টেশনের দিকে।

পেছন থেকে কে ডাকলো।

'সল্‌মা!'—

সল্‌মা ফিরে তাকালো। চেনা গ্যাঙ্‌ম্যান—বনোয়ারী। সলমা কিন্তু খুশি হয় না। মাথা ভরে আছে অসহায় দুর্ভাবনায়।

বনোয়ারী বললো—'কাম তো খতম।'

'হাঁ।'

ছোট উত্তর। ছোট একটু কথা। তারপর ভিন্ দেশী, ভিন্ জাতের দুটি মজুর আর কোনো কথা বলে না। সবটা যেন বলা হয়ে গেছে ওইটুকুর মধ্যে। তারপর যা—তা শুধু অনুভবের, মর্মান্তিক বোধশক্তির। সে ওরা দু-জনেই শুধু বোঝে আর পাশাপাশি হাঁটে—নিঃশব্দে।

'এইসা হাল। কাম খতম—তো বাস্, ভাগ।' বনোয়ারী ফুঁসে উঠলো হঠাৎ। 'মোকাবিলা চাই—জবাব চাই এক রোজ—চাই জরুর।'—

আস্তে আস্তে, জোর দিয়ে দিয়ে বলে বনোয়ারী ভাঙা ভাঙা ভাষায়। সল্‌মাও জবাব দেয় তেমনি। ভাঙ ভাঙা—ঠারে ঠুরে। এ যেন এক নতুন

ভাষা—দুটো ক্ষুধার্ত জাতের মানুষের কথা ; ছোট ছোট—সোজা সোজা। ভাঙা হলেও বুঝতে কোথাও কষ্ট হয় না।

'মুলুক যাবে ?' পশ্চিম প্রান্তরের শেষে শালবনের ধোঁয়াটে রেখার দিকে আঙুল তুলে শুধালো বনোয়ারী। বললে, 'কাল কম্‌লা নামে তোদের জাতের একটা মেয়ে বাচ্চা ভাইটার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে গাঁয়ে চলে গেল! রেল কারখানা বন্ধ করে দিলে জবরদস্তি—ওর বাপটাও মরে গেল পুলিসের বুট খেয়ে। তুইও তো চলে যাবি—না কি ?'

'না।' সল্‌মা ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো—যেন কেউ শুনতে পাবে, 'গেলে জেতের লোক হামাক্ মেরো ফেলবে।'

পেটে তার ভিন্ জাতের বাচ্চা আছে যে একটা !

স্টেশনের প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে ওরা ততক্ষণে এসে পড়েছে নির্জন রেল লাইনের ওপরে। দিনান্তের শেষ আলো তখন ঝকমক করছে ইস্পাতের সর্পিল লাইনের ওপর।

এবার যেন ওদের ছাড়াছাড়ি হবে এমনি ভাবে ঘুরে দাঁড়ালো বনোয়ারী। জিজ্ঞেস করলো, 'বিলবাবু কুছু পাত্তা দিলে ?'

অনুকরণ ক'রে বলে সলমা হৃদয় দত্তের কথা, 'বলে—চল্যে যা কসবী গ্যাঙ্।'

'কসবী গ্যাঙ্।' বিড় বিড় করে আপন মনে কথাটা আওড়ালো একবার বনোয়ারী—দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে, গোঙানো জন্তুর মতো। বললে, 'কাম খতম তো চলে যা কসবী গ্যাঙ—মেয়ে মানুষ হলে রেণ্ডি ব'নে রোজগার কর। আর মরদ হলে তার দালালি কর।' ক্ষ্যাপা ক্রোধ একটাকে চওড়া বুকের মধ্যে সবলে চেপে গেল সে আস্তে আস্তে। চুপ ক'রে লাইনের কাঁকরগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে কিছুক্ষণ—তারপর কাঁকর দেখা সেই একাগ্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলো সল্‌মার দিকে। বিড়বিড় ক'রে

আর একবার বললো, 'কসবী গ্যাঙ—রেণ্ডি গ্যাঙ্।' তারপর বলে উঠলো হঠাৎ :

'যাবে ?'

সল্‌মা তার বুনো চোখ দুটো মেলে বনোয়ারীর হঠাৎ বেপরোয়া ভঙ্গীমায় অদ্ভুত মুখটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো অসহায়ের মতো :

'আর কুথা যাবে ?'

'তব্ চল্।' ঘুরে দাঁড়ালো যাওয়ার জন্যে বনোয়ারী। চলতে চলতে বললো বনোয়ারী চাপা আক্রোশে, 'হামি ওই কসবী গ্যাঙ—রেণ্ডি গ্যাঙের লোক আছি সল্‌মা। হামার মা আছে—বহিন আছে তিনঠো'—

আরও আছে বনোয়ারীর মায়ের বয়সী দু-তিনটি স্ত্রীলোক এবং তাদের পিতৃপরিচয়হীন সন্তান-সন্ততির গুষ্ঠি। সব মিলে এক ছোট স্টেশন ঘেঁষা গুটি কয়েক টঙ। জংশন স্টেশনের বাবু স্টাফ রেলওয়ের ভাষায় ঠাট্টা করে বলে—কসবী গ্যাঙ—রেণ্ডি মেয়ে মানুষের আড়ৎ। রেল লাইনের কাজে ভাসতে ভাসতে কবে কোথা থেকে এসে জমে গেছে হঠাৎ আবর্জনার মতো। কোন্ দেশী মানুষ—কেউ জানে না, কারুর জানবার দরকার নেই। পরনে নোংরা ঘাঘরা, আর তেমনি নোংরা রংচটা ব্লাউজ—সেঁটে ধরে আছে যেন বলিষ্ঠ কাঠামোর বুকগুলোকে। সারা হাতে উল্কি আঁকা। ঘুষ দিয়ে কাজ বাগায় লাইনে। যখন কাজ থাকে না তখন বিন্নি ঘাস কেটে এনে সারা দিন ধরে ধামা বানায়, বানায় গেরস্থালীর টুকি-টাকি জিনিস, খুপী, প্যাটরা ইত্যাদি। লাল নীল রং ক'রে কাঁধে ঝুলিয়ে বেচতে যায় ট্রেনের যাত্রীদের কাছে অথবা জংশন স্টেশনের বাজারে। রাত হলে কেউ ঘুর্ ঘুর্ করে স্টেশনে—মাল-বাবুর ঘরের কাছে, কেউ দোস্তি করে গিয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের গুম্‌টি ঘরে। এমনি চলে এসেছে বছরের পর বছর। এখন তাদের ছেলেপুলেরা মরদ হয়ে গেছে।

এবার আর একজন বাড়লো সেই আবর্জনার স্তূপে। সল্‌মা।

বনোয়ারীর মা রুকমিনি হাতে ঘাসের পাঁজা নিয়ে অবাক চোখে তাকালো সল্‌মার দিকে।

'উ তুম্‌হার কাম করবে—সেবা করবে। থাকবে।' সলমার বোকা বোকা মুখের দিকে তাকিয়ে বনোয়ারী বললো রুকমিনিকে। আসবার পথে মনে মনে ভেবে সব ঠিক ক'রে ফেলেছে বনোয়ারী।

কিন্তু রুকমিনি অবাক। বাস্‌! হঠাৎ যেন 'তাজ্জব বাত্‌' বলে বনোয়ারী।

বনোয়ারীর গলা শুনে বেরিয়ে এলো বোনেরা।

'আঃ-হা—সল্‌মা!' বনোয়ারীর তিন বহিন এসে ঘিরে দাঁড়ালো সল্‌মাকে। এক সঙ্গে কাজ করেছে তারা ব্রিজে।

'ই হামার বিবি রঙ্গী।' বনোয়ারী বললে বড় বহিনকে।

'বিবি!' রুকমিনি যাচাই করা চোখে তাকালো বনোয়ারীর দিকে।

হৈ হৈ ক'রে ছেঁকে ধরলো বনোয়ারীর বহিনরা—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো সল্‌মা।

রঙ্গী সল্‌মার হাতে টান দিয়ে বললে, 'আরে বহিন!'—

'বাস। অব্‌ চলে হাম।' বনোয়ারী রাস্তায় নামলো।

'বনোয়ারী!'—

কোনো জবাব নেই।

রুকমিনি জবাব পায় না কোনদিন। এ ভারী আফশোষ তার। জানে না কোথায় চলে যায় বনোয়ারী রাতভর। বলে 'কাম' আছে। কি কাম? আফশোষ রুকমিনির : জবাব মেলে না। কস্‌বী গ্যাঙের রুকমিনির 'লেড়কাঠো' যেন অন্য রকমের মানুষ। শুধু একটাই 'মর্দানা' কস্‌বী গ্যাঙের যার 'কাম' রেল লাইনের ধারে ধারে বানভাসী খড় কুটোর মতো নয়। সে গ্যাঙম্যান। খুশি রুকমিনি, গর্বিত। কিন্তু বনোয়ারী যেন অনেক কি গোপন ক'রে যায়

রুকমিনির কাছে। আফশোষ। চাপা গলায় 'বাত্‌চিত্‌' যতো তার 'বহিন'দের সঙ্গে। কি সব কাগজ-পত্র নিয়ে যায় তারা জংশনে ঘাঘরার তলায় কোমরের ভাঁজে গুঁজে—নিয়েও আসে তেমনি। বনোয়ারী চলে যায় রাতভর —মজলিশ করে গ্যাঙে গ্যাঙে। কিন্তু তাজ্জব—মাতোয়ারা হয়ে ফেরে না তো কোনোদিন! রেণ্ডি গ্যাঙের হালচাল-ছাড়া বেখাপ্‌পা একটা মর্দানা।

কিন্তু সবটা একদিন পরিষ্কার হ'য়ে গেল রুকমিনির কাছে।

সল্‌মা আর রুকমিনি গিয়েছিল ঘাস কাটতে। মাথার বোঝা নামিয়ে রুকমিনি দেখলো—ঘর দোর ওলট পালট, বনোয়ারী নেই। তিন মেয়ে নেই। কস্‌বী গ্যাঙের আর সব মেয়েরা কাজের ধান্দায় গেছে কে-কোথায়। ঘরের মেঝেয় এক জায়গায় খানিকটা রক্ত লাল দগ্‌ দগ্‌ করছে। রক্তের ধারা ফোঁটা ফোঁটা গিয়ে মিশেছে পথের ধুলোয়। হারিয়ে গেছে।

তারপর ফিরে এলো কসবী গ্যাঙের দুই বহিন—ছেঁড়া ঘাঘরা, ছেঁড়া আঙিয়া। লাইনের কাঁকরে ছড়ে গেছে হাত পা। রুকমিনির ছোট মেয়ে মতিয়া—ঠোঁট কেটে ফুলে উঠেছে বন্দুকের কুঁদোর গুঁতোয়। রক্ত জমে আছে চিবুকের কাছে।

মেয়েটা ফোঁপায়, 'টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল রঙ্গীকে।'

'কোন্‌?'

'পুলিস। ফৌজ।'—

বড় বহিন রঙ্গীকে নিয়ে গেছে তারা। টানা হেঁচড়া করেছে বহিনরা ওদের সমস্ত শক্তি দিয়ে—শেষতক্‌ পুলিস পাকড়াও করে নিয়ে গেল মার-দাঙ্গা, ধস্তাধস্তি করে। এরা পারে নি শেষ পর্যন্ত বন্দুকের—সংগীনের মুখে। রুকমিনির ভাঙা প্যাঁটরা—টাকা-পয়সা লোপাট। ইশ্‌তেহার আর হ্যাণ্ডবিল গোছা গোছা টেনে বের ক'রেছে তারা তিন বহিনের লুকানো নানান জায়গা থেকে।

ছোট ঘরটুকুর মধ্যে ফুঁসে ফুঁসে ওঠে ছোট বহিনের ফোঁপানী। বয়স মাত্র হবে ওর ষোল কি সতেরো—আবেগে কাঁপছে থরথর করে তখনো। আর সব চুপ।

বনোয়ারীকে পাকড়াও ক'রতে এসেছিল পুলিস। তিন বহিন দরোজা বন্ধ ক'রে রুখে দাঁড়িয়েছে পুলিসের সামনে।

'বনোয়ারী নেহি।'

'ঘর তালাশ করবো—ছোড় দরোয়াজা।'

অনেক কি সব কাগজ-পত্র আছে বনোয়ারীর। তিন বহিন দরোজা আগলে দাঁড়ালো—ঘরে ঢুকতে দেবে না। হাল্লা গোলমাল হতে থাকে—এসে জড়ো হয় কসবী গ্যাঙের আর সব মেয়েরা। তারপর জবরদস্তি ধস্তাধস্তি, বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো। ঠেলাঠেলি করে পুলিস ঘরে ঢুকলো শেষ তক্। ভেঙে লণ্ডভণ্ড করলে রুকমিনির সংসার হাঁড়ি-পাতিল।

শেষ পর্যন্ত কিছু 'নিষিদ্ধ' কাগজপত্র তালাশ ক'রে ধরে নিয়ে গেছে রঙ্গীকে থানায়—জেরা করবে।

সব শুনে রুকমিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, 'বনোয়ারী?'

মতিয়া বললে, 'উ ফেরার।'

'ফেরার?'

মতিয়া বললে, 'হাঁ।'

'তো কাম চলবে কেমন ক'রে?'

দু'বহিনের আর কেউ কথা বলে না।

রুকমিনি আবার বললে ঝাঁঝালো গলায়, 'কোম্পানীর কাম চলবে কেমন করে?'

মেজ বহিন বললে আস্তে আস্তে, 'কাম তো খতম মা। ভেইয়া ছাঁটাই হয়ে গেছে।'

'কত দিন?'

'এক হপ্তা।'

'তো হামাকে বলিসনি কেউ!'

তারপর স্তব্ধ রুকমিনি ভাবতে বসে আকাশ পাতাল। সন্ধ্যে থেকে সারা রাত। আফশোষ! কিছুই জানে না সে—জানে শুধু বনোয়ারীর কথা তার বহিনরা। এক সময়ে শুধালো সে সল্‌মাকে :

'তু জানিস?'

সল্‌মা ছোট্ট ক'রে বললে, 'জানি।'

এও তবে সেই বহিনদের মতো। জানে না শুধু রুকমিনি! আপশোষ!

পরের দিন সকালে ফিরে এলো রঙ্গী পাগলীর মতো। চুলগুলো মাথায় তালগোল পাকানো। আঙিয়া ওর ছিন্নবিচ্ছিন্ন—মুখে, গলায়, বুকে যেন বুনো জানোয়ারের ধারালো নখের আঁচড়। বাইশ বছরের চওড়া কাঁধ একটা জোয়ান মেয়ে কিন্তু এক রাতের মধ্যে কেমন হয়ে গেছে যেন। সারা মুখে কে ঢেলে দিয়েছে কালি।

রুকমিনি শুষ্ক চোখে দেখছিল ওকে পায়ের ওপরের রক্তের দাগ লাগা ছেঁড়া ফাড়া ঘাঘরা থেকে মাথার চুলটি পর্যন্ত। রঙ্গীও তাকিয়ে ছিল শুকনো চোখে মায়ের দিকে। তারপর ভেঙে পড়েছিল হঠাৎ কান্নায়, মুখে হাত ঢাকা দিয়ে।

বুড়ো রুকমিনি। তবু লাঞ্ছিত অবমানিত জোয়ান মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়। এই রকম ছিন্নভিন্ন, নষ্ট, ভ্রষ্ট। চিৎকার ক'রে ওঠে রুকমিনি, 'যা যা—ভেগে যা তুই তোর

সেই ভাইয়ার সাথে। বেসরম! কাঁদতে সরম লাগে না তোর! অব্ যা—রেণ্ডি ব'নে যা সব কটা বহিন।'

কেমন একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো! বুঝতে পারে না ঠিক রুকমিনি।

হঠাৎ দিনগুলোর ওপরে কারা যেন রেল লাইনের তীক্ষ্ণধার বেলে পাথুরী কাঁকর বিছিয়ে দিয়ে গেল। কসবী গ্যাঙ, গুম্‌টি ঘর, জংশন স্টেশনের অফিস, কারখানা, কুলি লাইন—সর্বত্র একটা দাঁত-চাপা গোঙানি: ছাঁটাই, পুলিস জুলুম, গ্রেফতার, গুলী—গুপ্তচর। আর কী ক্ষুধা! এরই মাঝখানে ইশ্‌তেহার ঘোরে কড়া পড়া নোংরা হাতে হাতে, পোস্টার পড়ে দেয়ালে দেয়ালে—রুটি দো: কাম দো। বারুদঠাসা থমকানো আবহাওয়ার অন্তরালে দুর্জ্ঞেয় নিয়তি যেন সুতো কেটে চলেছে দিন রাত্রি ধরে।

রুকমিনি আয়ত্ত করতে পারে না সবটা।

এর ভেতরে একদিন তিন বহিন জংশন স্টেশন থেকে ফিরে এসে খবর দিল, 'হর্‌তাল্। চাক্‌কা বন্দ্।'

বিলকুল কুলি-কামিন ভোট দিচ্ছে: হর্‌তাল। বহুদিনের পীড়নের জবাব।

মতিয়া আঙিয়ার ভেতর থেকে একটা ইশতেহার বের করলো। বললে, 'ইস্‌মে লিখা হ্যায়।'

রুকমিনি কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করলো এপিঠ-ওপিঠ। পড়তে জানে না। চুপ করে বসে রইলো। মনের মধ্যে ঝড় বইছে যেন। বেসামাল কথাটা বেরিয়ে এলো শুধু মুখ দিয়ে, 'বনোয়ারী।' ...

রঙ্গী চাপা গলায় বললে, 'চুপ। আছে সে—ঠিক আছে।'

সল্‌মা শুনছে কান খাড়া ক'রে।

মতিয়া বললে, 'ই ছাঁটাই, দাঙ্গা, হামলা, গিরেফতার—ভুখা, এর জবাব মিলবে তামাম হরতালে।'

রুকমিনি বললে, 'তো কাল হামি ভি ভোট দিতে যাব।'

'তোমার ভোট নাই—আমাদের ভি নাই।' রঙ্গী বললে, আস্তে আ াস্তে।

তিন বহিন ভোট দেয়নি শুনে হঠাৎ যেন জ্বলে ওঠে রুকমিনি।

'কাহে ?'

নিয়ম নয়। ভোট দেওয়ার অধিকারী শুধু কোম্পানীর নোকর—কুলি-কামিন স্টাফ। বাজে ছুট কুলি-কামিনের ভোট নাই। এর বেশী বোঝাতে পারে না তিন বহিন।

'তব ক্যা রেণ্ডি বনেগী ?' রুখে উঠলো রুকমিনি। বুড়ো হাতটা কাঁপছে উত্তেজনায়—কাঁপছে আঙুলে চেপে ধরা ইশ্‌তেহারটা—কাঁপছে লেখাগুলো : রুটি দো—কাম দো। 'বোলো—বোলো।' রুকমিনির বুড়ো গলা কাঁপতে থাকে, 'তু কাম না চাও—তু রোটি না মাঙো ! অব তু রেণ্ডি বনো—বাস্। তু আপনা ইজ্জৎ বেচো ! কাহে ?' কাহে ! বুড়ো চোখে, ওর বুড়ো দেহে হঠাৎ জেগে ওঠা দীর্ঘদিনের নির্লজ্জ অবমাননার ক্ষোভ ফেটে পড়ে হঠাৎ—যুবতী মেয়েগুলো চেয়ে থাকে তার দিকে দাঁতে দাঁত চেপে। ওদেরও সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকে সেই কথাটা—'কাহে ?'

মায়ের সামনে ওরা আর যেন দাঁড়াতে পারে না—সরে যায়।

সূর্যাস্তের শেষ আলো ঝিলমিল করছে লাইনের লোহায়—দূর থেকে দূরান্তরে। এর দু-পাশে গুমটিতে গুমটিতে, লাইনে লাইনে চাপা ক্ষুব্ধ গোঙানী একটা পাকিয়ে উঠছে ক্ষুধার্ত দেহগুলোর পাকে পাকে মা রুকমিনির সারা জীবনের তিক্ততার মতো।

'ইঞ্জিনার সাহাব !'—

কে যেন বলে উঠলো বাইরে চাপা গলায়।

ইঞ্জিনীয়ার সাহেব। ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়ালো একদিন প্লাটফর্মে।

সঙ্গে একটি বউ—অল্পবয়সী। লাল সবুজে মেশানো কচি শালপাতার মতো ছলছলানো। দিনান্তের মরা আলোয় পরনের আসমানি সাড়ীতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। ট্রেন চলে গেল। শূন্য প্লাটফর্মের একপ্রান্তে দাঁড়ানো দুটো মূর্তির দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো কসবী গ্যাঙের মেয়েরা।

সেই ট্রেনে জংশন স্টেশন থেকে এলো কসবী গ্যাঙের রঙ্গী। সে এসে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের দিকে আঙুল তুলে বললে, 'দেখো হারামীকে।'

একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সঙ্গে কে? বহু?'

'বহু তো—কিন্তু দুসরা আদমির বহু। ওর ভেড়ুয়া মরদটা সিগ্রেট আনবার নাম করে শালা হারামীর কামরায় বহুটা তুলে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিলে। দেখো না—যাচ্ছে ফুর্তি করতে।'

এ ব্যাপার নতুন নয়—হঠাৎ এ রকম চড়াও-হামলার অভিজ্ঞতা আছে কসবী গ্যাঙেও।

সাহেব আর বউটির মূর্তি দূরে অস্পষ্ট হয়ে এলো। ওরা চলে যাচ্ছে পশ্চিমের প্রান্তরের মধ্যে। দূরে শাল মহুয়ার বনছায়া।

কসবী গ্যাঙের মেয়েরা জিভে চুক চুক শব্দ করে উঠলো। গাল পাড়লো রঙ্গী—কে জানে কার উদ্দেশ্যে:

'ইয়ে কুত্তাকা মাফিক'—

'কার বহু?'

'কে জানে। হোগা, কই দালাল কেরানিবাবুর।'

সেই দিনই সন্ধ্যের দিকে সেই কার না কার বহুটাকে কাঁধে ধরাধরি করে নিয়ে ফিরলো রুকমিনি আর কসবী গ্যাঙের কয়েকটি মেয়ে। বিকেলের দেখা সেই টুকটুকে বউটাকে দেখতে হয়েছে এখন এক রাত হাজতে না কোথায় কাটানো সেই রঙ্গীর মতো। একটা পা মচকে ভেঙে গেছে। উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। গায়ে মুখে মদের গন্ধ।

'আরে—কোথায় ছিল এ ?' বিকেলে দেখা কসবী গ্যাঙের মেয়েরা জিজ্ঞেস করলো অবাক হয়ে।

'একটা টিলা থেকে পড়ে গেল চেঁচাতে চেঁচাতে। ঘাস কাটছিলাম আমরা—ছুটে গিয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে তখনও সেই হারামী ইঞ্জিনার সাহেব। আমরা কাস্তে নিয়ে তাড়া করতে—পালিয়ে গেল।'

রঙ্গী ভাঙা ভাঙা ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, 'কাঁহা গেছলে ?'

বউটা শুকনো গলায় ঢোক গিলে বললে, 'শাল মহুয়ার বন'—

··· হায় শাল মহুয়ার বন ! ···

মতিয়া ওর কাপড়ে মদের গন্ধ শুঁকে বললে, 'দারু পিয়েছ ?'

'জোর ক'রে খাওয়াতে চাইছিল।'

কসবী গ্যাঙের মেয়েরা চাইলো চোখে চোখে।

কার বহু কেউ জানে না—বুঝতে পারছে শুধু একই রকম একটা দুর্ভাগ্যকে। এমন সময় সল্‌মা এসে দাঁড়ালো ভিড়ের মাঝখানে—সন্তান-ভারাতুর, স্তব্ধ। বউটাকে দেখে বলে উঠলো সে, 'হামি চিনি গো।'

'কে !'

'আরে বিলবাবুর বহু। আহা—বড় ভালো মেয়া গো। হামাক একদিন মুড়ি দিলেক—জল দিলেক খেতে।' সল্‌মা বললে দম নিয়ে, 'আর বিলবাবু হামাক্ সেদিন তাড়িয়ে দিয়ে বললে—চলে যা কসবী গ্যাঙ।'

বউটির পরিচয় শুনে মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে রঙ্গীর। বলে উঠলো, 'বিলবাবু! আরে দালাল! আভি চলে হাম জংশন। বলবে বিলকুল কুলি-কামিনকে'—

সল্‌মা বললে, 'হামিও যাব। বলব সে দালালকে যেয়ে—চল এখন তোর নিজের বহু দেখবি কসবী গ্যাঙে।'

বহুটা কাৎরে উঠলো হঠাৎ।

'আহা রে বহিন !' রঙ্গী আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়ে দিল অনিলাকে।

তিন বহিন আর সল্‌মা নীরবে তাকালো পরস্পরের দিকে।

রঙ্গী দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'চল।'

'চলে।'—

ওদের দ্রুত পায়ের শব্দ কর্ কর্ ক'রে উঠলো রেল লাইনের কাঁকরে—গ্যাঙে, গুমটিতে, জংসনে—স্টেশনে।

রুকমিনি বসে রইলো একা—সামনে শুয়ে আছে বহুটা চোখ বুজে, মরার মতো। ঘন হয়ে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে যেন কূল-কিনারা পায় না রুকমিনি।

একটি ট্রেন থামলো—চলে গেল সিটি দিয়ে। তারপর গোরুর গাড়ীর ক্যাঁচ-কোচ শব্দ একটা থামলো এসে দমচাপা ক্ষুধার্ত কসবী গ্যাঙের পাশে। মাতোয়ারা গলা শোনা যায় একটা : 'এ পিয়ারী—পুন্নি !'—

সেই বানিয়া লালাজী। পুন্নিকে তুলে নিয়ে চলে গেল গোরুর গাড়ীতে।

কাঠ হয়ে বসে রইলো রুকমিনি—শুনতে লাগলো সব। আফশোষ তার—বনোয়ারী নেই। কর্মহীন—ক্ষুধার্ত দিন। কসবী গ্যাঙের মেয়েগুলো ঘুম্‌ঘুম্ করছে কে কোথায়। জোয়ান মেয়েগুলো রেণ্ডি কসবী ব'নে যাচ্ছে আবার! কাম নেই। চারিদিকে ঘেরা কালি ঢালা অন্ধকারে তারই সারাটা জীবন যেন কে লেপটে রেখে গেছে। বনোয়ারী নেই। রুকমিনির বুড়ো শুকনো চোখ দুটো নিংড়ে জলের ফোঁটা নামলো আস্তে আস্তে।

এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালো মতিয়া—নীরবে দেখলো শুধু মায়ের চোখের জল।

রুকমিনি বললো আস্তে আস্তে, 'মতিয়া, সাচ বাত্ বলবি।'

মতিয়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো মায়ের দিকে।

রুকমিনি বললে, 'বনোয়ারী ভালো আছে?'

'আছে মা।'

'সাচ বাত্?'

'সাচ।'

'দেখা হয় না?'

'জানি না।'

এক রকম—সব বহিনগুলো এক রকম, ওদের ভাইয়ার মতো চাপা। রুকমিনি রাগ ক'রে বসে রইলো—আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করলো না।

শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ রুকমিনির সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে সল্মার ওপরে: অলক্ষুণে মেয়েটা আসার পরই সব কেমন ওলট-পালট হ'য়ে গেল তার সংসারে। বনোয়ারী তো কেটে পড়লো কোথায়, আবার চাপিয়ে গেল একটা বেজাত মেয়েকে। পেটে তার কার ছেলে কে জানে!

কিছুক্ষণ একমনে গাল পাড়লো রুকমিনি যাচ্ছেতাই করে। সল্মা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে বসে রইলো এক কোণে। চোখে ওর অসহায় ভয়: যে তাজ্জব লোকটা এনেছিলে তাকে এখানে—সে নেই।···

রুকমিনি চেঁচাচ্ছে, 'ভাগুক—ভেগে যাক সবাই সেই ফেরার আদমির সঙ্গে।'—

এমন সময় বহিনরা খবর আনলো, 'বনোয়ারীর সঙ্গে দেখা হবে আজ।'

'বনোয়ারী!' রুকমিনি চকিতে মুখ তুলে তাকালে।

'হাঁ, কিন্তু হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার হয়ে যেতে হবে।'

কোন বহিন বুঝি ফিস ফিস করে কি বললে সল্মাকে ঠাট্টা ক'রে। ভয় আর সন্ত্রস্ততার মাঝখানে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো সল্মা। সেই তাজ্জব লোকটার সঙ্গে তবে দেখা হবে তার।

নির্দিষ্ট জায়গায় বনোয়ারী এলো অনেক রাতে।

আর পেছনে পেছনে এলো তার গোয়েন্দা। তারও পেছনে পুলিস—ফৌজ! গ্যাঙে গুমটিতে আগুন লাগানো লোক একটাকে ধরবার জন্যে তারা বহুদিন থেকে ওৎ পেতে আছে।

অন্ধকারে বসেছিল ওরা বনোয়ারীর সঙ্গে। হঠাৎ সুরু হলো এদিক ওদিকে হুইশিলের শব্দ আর টর্চের ঝিলিক। চারিদিক থেকে ঘিরে এসে দাঁড়ালো সঙীন উঁচু ক'রে।

'হাত তোলো—হাত তোলো।—'

মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারে বহিনরা। বাঘিনীর মতো সামনে গিয়ে আড়াল ক'রে দাঁড়ায় বনোয়ারীকে। ফেটে পড়ে ক্রোধে, 'আরে হারাম—ভাইয়াকে লেবে! রেণ্ডি বানাবে মাকে, বহিনকে বহুকে! দুষমন!'—

কিন্তু কোন দিক আড়াল করবে বাঘিনীরা! তিন বহিনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে পাকড়াও করেছে বনোয়ারীকে কয়েকজন।

ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরেছে রুকমিনিও: যেতে দেবে না বনোয়ারীকে। চেঁচাতে থাকে সে। চেঁচানি শুনে ছুটে আসে কসবী গ্যাঙের মেয়েরা—বেকার আর নেশাখোর মরদেরাও। শেষ বারের মতো তারা যেন ঋজু হয়ে দাঁড়ায় গুলী খাওয়া শিকারী বাঘের মতো। বনোয়ারীকে নিয়ে টানা হেঁচড়া ধস্তাধস্তি চলে রেল-লাইনের কাঁকরের ওপরে। অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখা যায় না—কচ্ কচ্ ক'রে ফুঁড়ে যায় শুধু ধারালো সঙ্গীনগুলো। হটে যাচ্ছে।—পাগলের মতো রেল লাইনের কাঁকর আঁচড়ায় মেয়েগুলো—মা বহিন বহু। হটে গেল ওরা। চোখ কানা-করা কি একটা ধোঁয়ার তালের মধ্যে দিশাহারা হয়ে যায় ওরা শেষ পর্যন্ত।

মতিয়া চিৎকার ক'রে ওঠে, 'মা!'—

'ছোড় মৎ রঙ্গী—ছোড় মৎ মুন্নি।' ধোঁয়ার তালের মধ্যে রুকমিনির দম-চাপা খ্যাপা গলাটা শোনা যায় শুধু।

মতিয়া কেঁদে উঠলো আবার, 'কিছু ঠাওর হচ্ছে না। আন্ধা হো গিয়া —আন্ধা হো গিয়া। মা!'—

'আঁ—া!'—

'ও হো—হো।' মতিয়ার কচি গলার একটা ফোঁপানো কান্না ঠেলে আসে শুধু। ওরা হটে গেল।

রাত আবার গভীর হয়ে এলো কসবী গ্যাঙের অন্ধকার ঘিরে। ক্ষোভে ব্যর্থতায় ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরে ফিরে এসেছে সবাই। অভিব্যক্তিহীন শূন্য চোখে ফোঁপাচ্ছে মতিয়া অসহ্য যন্ত্রণায়—তার পাশে দু-বহিন স্তব্ধ। রুকমিনি দুয়ার ধরে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে অন্ধকারের দিকে।

হঠাৎ এক সময়ে খেয়াল হলো রঙ্গীর—অন্ধ বহিনটাকে ধ'রে বসে আছে তারা দু-জন, কিন্তু সল্‌মা কোথায়? অনেকক্ষণ হয়ে গেল—সবাই ফিরে এলো লাইনের ওপর থেকে, সল্‌মা তো ফেরেনি!

পায় পায় এগোলো রঙ্গী লাইনের দিকে সল্‌মাকে খুঁজে খুঁজে—পেয়ে গেল এক জায়গায়। মেয়েটা বসে আছে লাইনের ওপরে—চেয়ে আছে অন্ধকারে, বনোয়ারীকে যেদিকে ধরে নিয়ে গেছে। শ্রান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে যেন বসে পড়েছে এক জায়গায়। তারপর বসে বসে ভাবছে—এবার যাবে সে কোন দিকে।

'সল্‌মা!' রঙ্গী ডাকলো আস্তে।

সল্‌মা তাকালো শূন্য চোখে।

'চল বহিন।' রঙ্গী হাত ধরে টান মারলো তার।

'কুথাকে!' যেন অবাক হয়ে বললো সল্‌মা আস্তে আস্তে। চেয়ে রইলো বোকার মতো।

'ঘরে যাবি না?'

ঘর ? তবু চেয়ে আছে সল্‌মা—যেন বুঝতে পারছে না। ঘর কোথায় তার ? যে এনেছিল তাকে একদিন—সে আজ চলে গেল। কে জানে কত-দিনের জন্যে। যাচ্ছেতাই করে গাল পেড়েছে রুকমিনি আজই। বুনো মেয়েটার চোখ ছলছল করে এলো।

'আরে বহিন।' কর্কশ গলাটা কাঁপে রঙ্গীর। টেনে তোলে সল্‌মাকে। 'চল বহিন। বনোয়ারী তো আসবেই এক রোজ। যতোদিন সে নাই—ততোদিন আমরা তো আছি! বাঁচবার জন্যে সবাই মিলে গতর দিব বহিন। তোর লেড়কা হ'লে মানুষ করবো তাকে সবাই মিলে। তারপর ভাইয়া এলে'—

গলা কেঁপে থেমে গেল রঙ্গীও। বুনো মেয়েটা ফোঁপায় রঙ্গীর কাঁধে মুখ গুঁজে—দুঃখে নয়, আত্মীয় হৃদয়ের সহানুভূতিতে। আকাশে গভীর রাত্রির অগণিত নক্ষত্র যেন দীপ্ত চোখে চেয়ে আছে গলায় গলায় জড়ানো ভিন্ জাতের এই দুটি মেয়ের উদ্ভাসিত মুখের ওপরে।

নায়ক-নায়িকা

কাচ্চাবাচ্চা মেয়ে-মরদ করে জনা বারো হবে। শড়কের ধারে গাছের ছায়ায় বসে পান্তা ভাত খেয়ে উঠলো আবার বোঁচকা-বুঁচকি হাঁড়ি-কলসী নিয়ে। চললো পুবমুখো।

'কুথাকে যাও বটে গো?' ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গাড়ী থেকে জিজ্ঞেস করলো হট্‌লগর মাঝি।

জবাব এলো, 'খড়গপুর।'

'হাত্তোর খড়গপুর ... খড়গপুর!' হঠাৎ ক্ষেপে যায় হট্‌লগর। পিটোতে থাকে গাড়ীর গোরু দুটোকে। এলোপাথাড়ি। খড়গপুর নামটা শুনলেই আজকাল ক্ষেপে যায় সে। দলকে দল—দিনের পর দিন—সব চললো বন-বাদাড় গ্রাম-ঘর ভেঙে মেয়ে মরদ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সেই কোন জাত খোয়ানোর বাজারে—ইজ্জত বেচার কারখানায়। যাক চুলোয়! শয়তান ওদের পেছু নিয়েছে নির্ঘাৎ।

সকৌতূহলে শুধোয় তবু সে, 'কুথা থেকে এলেক বটে?'

'পাথরডাঙা গো!' জবাবের সঙ্গে ক্লান্ত বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস মেশানো।

কোথায় সে পাথরভাঙি লাল মাটির দেশ! আরও পশ্চিমে।

তবু তো গ্রাম-দেশ! তার জন্যে হট্‌লগরের অদ্ভুত এক মমতা: পূর্বপুরুষের

গ্রাম, হাতে তৈরী পাথরভাঙা জমি, জাতের মানুষ—সব ছেড়ে চললো কি-না ওরা অজাতের দেশে! হট্‌লগর গর্‌গর্‌ করে ক্ষেপে পায়ের গুঁতো মারে গোরু দুটোকে। বললে, 'তো সব ছেড়ে চললে তুমরা! যাও ক্যানে?'

'যাই ক্যানে?'

নেংটি-আঁটা চওড়া-কাঁধ যে আধবুড়ো লোকটা কথা কইছিল হট্‌লগরের সঙ্গে, সে তাকালো এবার চোখে চোখে—ক্ষোভে, ক্রোধে। খোঁচা লেগেছে যেন। বললো:

'তোর ঘর কুথা হে? জানিস তুই, মোদের মেয়াগুলার ইজ্জৎ কেড়ে লিলেক, ঘর জ্বালাই দিলেক, তিনটো মরদ খুন হয়ে গেল বন্দুকের গুলিতে!' লোকটা গর্‌গর্‌ করে উঠলো খোঁচা-খাওয়া হুলো বেড়ালের মতো, 'আর মোরা—মোরা জঙ্গল সাফ করলম, পাথর ভাঙলম, জমিন করলম, চাষ করলম। আর বাস্‌! সিংজী বলে দিলেক কি না—জমিন তোদের লয়, পালা! জঙ্গলেও ঢুকতে দিলেক না, কাঠও কাটতে দিলেক না!'

'বটা—বটা—বটা!'—

সপাসপ মার খেয়ে গোরু দুটো ছুটলো গাড়ী নিয়ে। মুখে অদ্ভুত একটা গোরু খেদানো শব্দ হট্‌লগরের। সাঁওতালদের দলটাকে ছাড়িয়ে চলে গেল তার গাড়ী।

'বটা—বটা!' মেজাজ খিচড়ে গেছে তার।

চলে যাচ্ছে এমনি দলকে দল সাঁওতালরা, শুধু আজ নয়—এমনি বহু দিন। হট্‌লগর দেখেছে আর ক্ষেপে গেছে। যাচ্ছে কোথায় কোন খড়গপুর—রেল কারখানা—কলোনী। আরও দূরে কোথাও খনি অঞ্চলে। মেয়েদের কালো কালো চওড়া পিঠে কচি কচি ছেলে বাঁধা। নেংটি-আঁটা পুরুষগুলোর কাঁধে ভার—তাতে ঘর-সংসার সব বাঁধা ছাঁদা: ছেঁড়া কাঁথা, খেজুর পাতার চ্যাটাই, মায় ভাতের হাঁড়িটি পর্যন্ত। মেয়েদের গায়ে কোমরে যা হোক

কাপড় আছে একটু। মরদদের শুধু কাছা আঁটা—ইঞ্চি কয়েক নোংরা কাপড়ের ফালি এক-একটা ঘুরে গেছে দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে সামনে থেকে পেছনে। এমনি দলকে দল চলে যাচ্ছে পুবমুখো এই শড়ক ধরে। কাঁকর-ভাঙা চওড়া লাল শড়কটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল আর বনবাদাড় ভেঙে। ঘুরে, এঁকে-বেঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে রেললাইন এক একটা স্টেশনে। সাঁওতালরা এসব স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপে না, হাঁটা-পথ ধরে। ট্রেনে চাপলে চাপে গিয়ে একেবারে খড়গপুরে, সেখান থেকে ছিটকে ছড়িয়ে যায় কে কোথায়, কেউ কেউ থেকে যায় হয়তো বা কুলি লাইনে। সেইখানে পচে—মরে: হট্‌লগরের কথায়—জাত খোয়ায়।

হট্‌লগর এ-সব সহ্য করতে পারে না। কারুর চলে যাওয়া দেখলেই সে ক্ষেপে যায় মনে মনে আর নিজেও যেতে পারে না। মাস গেল। বছর গেল। থেকে থেকে শুধু সে তেতেই উঠতে লাগলো।

গাড়ী হাঁকিয়ে বড় শড়ক ছেড়ে সে ঘুরে গেল ডান দিকে—স্টেশন মুখো। সামনেই স্টেশন। ঘেঁষাঘেঁষি লাল টালির চালা, স্টেশন কোয়ার্টার, দু-একটা গোলপাতার চালার চায়ের দোকান—এক আধটুক মানুষের সাড়া। তারপর আর সবটা ফাঁকা—পোড়া প্রান্তর। তামাটে মাটি ঠেলে বুক চিতিয়ে চিতিয়ে আছে এখানে ওখানে মাটির তলার পাথুরে তরঙ্গ। স্টেশন থেকে কিছুটা তফাতে একটা পোল পেরিয়ে গাছের ছায়ায় গাড়ী থামালো হট্‌লগর। গোরু দুটোকে খুলে বটগাছের ঝুরিতে বেঁধে দিল। পোলের তলা দিয়ে একটা ঝোরা চলে গেছে চওড়া সোঁতার ওপর দিয়ে উধাও পোড়া প্রান্তরের দিকে, বালি আর কাঁকর ঠেলে। সেই ঝোরার জলে স্নান করে এলো সে, তারপর গাড়ীর ছাউনির ভেতর থেকে টেনে বার করলো ঘটি, থালা, কড়াই, পুঁটুলিতে বাঁধা চাল ডাল। রাঁধবে এবার।

গাছের তলায় উনুন পাড়াই আছে—ভাঙা, আস্ত, এমন অনেক। শড়কের

ধারে ধারে—গাছের তলায় তলায়। পোড়া কালিমাখা মাটিতে রাঁধাবাড়ার চিহ্ন—কে কবে রেঁধে খেয়ে গেছে। দেশছাড়া সাঁওতালদের দল। একটা ভালোমতো উনুন বেছে নিয়ে কড়াই চাপিয়ে দিল হটলগর।

কিন্তু উনুন আর ধরে না কিছুতেই। শুকনো পাতা ডালপালা এনে উনুন প্রায় ভরিয়ে ফেললে সে। ফুঁ দিয়ে দিয়ে গলা শুকিয়ে গেল, ধোঁয়ায় জ্বলে জ্বলে চোখ দুটো লাল হয়ে গেল, নাকের জলে চোখের জলে ভেসে গেল সারা মুখ। উনুন আর ধরে না। গাছের তলা আর শড়কের কিছুটা ভরে গেল ধোঁয়ায়, ধোঁয়ার তাল উঠতে লাগলো আকাশে—হাওয়ায়।

একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো হটলগরের পেছনে। সঙ্গে একটি শুকনো-মুখো ছেলে বছর বারো চোদ্দর। ওরা বসে ছিল অন্য এক গাছতলায়। ধোঁয়া দেখে এ গাছের তলায় এসে বসলো। বসেই থাকলো। চুপ চাপ। এদিকে হটলগর ফুঁ দিচ্ছে প্রাণপণে উনুনে।

মেয়েটি বলে উঠলো হঠাৎ, 'উ ধরবেকনি।'

হটলগর মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলো। দেখলো তো দেখলোই : চৌকো মুখ একটি মেয়ে, গাল দুটো একটু বসে গিয়ে মুখে এনে দিয়েছে বিষণ্ণ কাঠিন্য—বছর কুড়ি বয়স হবে জোর। শুকনো শুকনো মুখ, শুকনো শুকনো চুল। তার জাতের মেয়ে। যদিও পরনের কাপড় তার খাটো নয় হাঁটু পর্যন্ত, চুলগুলো কট্‌কটিয়ে বাঁধা নয়—খোলা। পরদেশী-পরদেশী ভাব। কেমন যেন ঢিলেঢালা—ক্লান্ত। তবু জাতের মেয়ে চিনতে কষ্ট হয় না হটলগর মাঝির।

উনুনের দিকে চেয়ে হটলগর বললো, 'শালার ধরতে চাইছে না কিছুতে। দেখ দিকিন হাল্লাকের কাণ্ড!'

'আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। সরে যাও।'

হটলগর খুশি হলো। সরে দাঁড়ালো।

উনুনের ভেতরে যতো পাতা আর ডালপালা ঠাসা ছিল সব টেনে বার করলো মেয়েটি। নিপুণ হাতে উনুন সাজালো আবার। বললো :

'দুটো শুকনো পাতা লাগবেক।'

গাছের তলা থেকে শুকনো পাতা হাটকে আনলো হট্‌লগর যত পারলো। কিন্তু অল্প দুটি পাতা উনুনে ফেলে দিয়ে ফুঁ দিতেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

হট্‌লগর হেসে উঠলো। বললো, 'বাস্‌। শালার যার কাজ তাকে সাজে।'

উনুন ধরিয়ে দিয়ে মেয়েটি আবার বসলো গিয়ে ছেলেটার গা-ঘেঁষে।

হট্‌লগর জিজ্ঞেস করলো, 'কুথাকে যাবি গো তোরা ?'

'পচ্ছিম। সে অনেক দূর।'

পুবে নয়। সেই হতচ্ছাড়া খড়গপুরের দিকে নয়! ...

খুশি হলো হট্‌লগর।

'কুথা থেকে এলি বটে ?'

'খড়গপুর।'

'ভাল—ভাল।'

যাক, একটা জাতের মেয়ে তবু হতচ্ছাড়া ওই খড়গপুর থেকে চলে এলো তো—এ খুব ভালো কথা। মনে মনে ভারী খুশি হয়ে তবু জিজ্ঞেস করলো হট্‌লগর, 'চলে এলি কেন ?'

'কারখানা থেকে বার করে দিলেক মোদের। মিলিটারী এল। বাপটাকে মোর মেরে ফেললেক উয়ারা। কারখানা বন্দ করে দিলেক।—সে আনেক কাণ্ড।'

আরো খুশি হলো হট্‌লগর : এই সেই হতচ্ছাড়া খড়গপুর—বেজাতের বাজার! সেখানে এমন ধারা কাণ্ড হবেই তো! থু!—

'কি নাম তোর ?'

'কম্‌লা।'

ভালো লাগছে মেয়েটিকে হট্‌লগরের—দরদী, উপকারী। এবার ছেলেটির দিকে চোখ তুলে বললো, 'উ চ্যাংড়াটো কে?'

'মোর ভাই।'

উনুনে বসানো কড়াইয়ের জল গরম হয়ে উঠছে। সেই দিকে একভাবে চেয়ে আছে কম্‌লা। চেয়ে চেয়ে বললো, 'সেই খড়গপুর থেকে মোরা চলে চলে এলম। দু-দিন মোর ভাইটা খায় নাই কিছু। দুটি চাল লিবে তুমার সঙ্গে? শুধু ওর জন্যে।'

তাই! ··· গায়ে পড়ে উনুন ধরানোর আসল কারণটা এতক্ষণে যেন সাফ হয়ে গেল হট্‌লগরের কাছে। কারখানা-বাজার থেকে ঘুরে-আসা ফন্দিবাজ মেয়ে—সেয়ানা খুব! ··· হট্‌লগর সন্ধিগ্ধ চোখে চেয়ে বললো:

'চাল আছে?'

কম্‌লা মাথা নাড়ল। চাল নেই।

'তবে? পইসা আছে?'

তাও নেই। কম্‌লা ফের মাথা নাড়লো।

'তবে?'—

কম্‌লা ঘাবড়ানো চোখে তার দিকে শুধু চেয়ে রইলো। আস্তে আস্তে বললো, 'শুধু মোর ভাইটার জন্যে।'—

'শুধু এই কটি চাল আছে বেশী।' বলে দেখালো হট্‌লগর বাড়তি চাল কটি। গর্‌-গর্‌ করতে করতে ঢেলে দিল সেই চাল কটি কড়াইতে। বললো, 'দু-দিন খাস নাই—অনেক খাবি তোরা। তো এতে হবে কেনে! হাঁ।'

তারপর একটা চুটা ধরিয়ে গাছ তলায় চেপে বসলো সে। শুধালো:

'আর কে আছে তোর?'

'কেউ নাই আর।'

'তবে ? যাচ্ছিস—থাকবি কুথা ?'

'জাতের মানুষ-জন আছে তো !'—

'যা:, উনুনটা নিবে গেল আবার !' হট্‌লগর উঠলো।

'বস তুমি—বস।' কম্‌লা উঠলো তাড়াতাড়ি। বললো, 'আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।'

উনুন ধরিয়ে উনুনের পাশে এবার চেপে বসলো কম্‌লা।

ভালো লাগে মেয়েটাকে হট্‌লগরের। আবার ভালোও লাগে না। বাজার-কারখানা ঘোরা মেয়ে—ফন্দিবাজ। কেমন যেন কায়দা করে তার ভাতে ভাগ বসিয়ে দিল এই কিছুক্ষণ আগে! এমনিতে বেশ লাগে—যেমনটি তার জাতের মেয়ে হয়। কিন্তু তবু কোথায় যেন খচ্‌ খচ্‌ করে কাঁটার মতো। জাত খোয়ানো বাজার-কারখানা ঘোরা মেয়ে হাজার হোক।

তবু কথা কয় ওরা—আলাপ করে। আড়ষ্টতা কেটে যায়। হট্‌লগর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে চুটা টানে। কম্‌লা উনুনের পাশে পা ছড়িয়ে ভাত রাঁধে। হট্‌লগরের খবর নেয়।

'ই গাড়ী আর গোরু তুমার ?'

'তবে ?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো হট্‌লগর: মেয়েটা বিশ্বাস করছে না না-কি !

'বেশ ভালো গোরু—চম্‌ফল আছে।' কমলা বললো, 'চাষও করে ?'

'করে।' তারপর কত জমি চাষ করে, তাও গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দিল হট্‌লগর, 'পাঁচ বিঘা।'

কম্‌লা নরম গলায় বললে, 'তুমি মাতব্বর ?'

'না।'

তবু খুশি হয়ে হাসে হট্‌লগর। মেয়েটাকে অবাক করে দিয়েছে।

'বউ আছে তুমার ?'

'না।' হট্‌লগর বললে, 'এবার ধান কাটার পর হবে।'

'অ।'

কিছুক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলে না। হট্‌লগর খুশি হয়ে চুটার ধোঁয়া ছাড়ে। কম্‌লা উনুনে জ্বালানি দেয়। ভাত ফুটছে। কম্‌লার ভাইটা গভীর চোখে চেয়ে আছে কড়াইর দিকে আর জিভের তলায় জমা হওয়া লালা গিলে ফেলছে থেকে থেকে।

হঠাৎ কম্‌লা বলে উঠলো, 'তুমি সুখী লোক—মাতব্বর মানুষ।'

হট্‌লগর কোন কথা বলে না। কম্‌লাও চুপ ক'রে যায়। তারপর আস্তে আস্তে সে তার নিজের কথা বলে। কাটা কাটা—ছেঁড়া ছেঁড়া। জবরদস্ত কারখানা বন্ধ—বাপের গুলী খেয়ে মরা—বেকারী—বেইজ্জৎ। তার রুক্ষ চুল—ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখটার গাম্ভীর্য আর ছেঁড়া ছেঁড়া কথা—সবটা তার মুখে এনে দেয় কঠিন এক শ্রীময়তা। সামনের পোড়া প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলে সে। বলে :

'মোর ভাইটা যদি মরদ হত!'

'কি হত তা হলে?'

'কাম খুঁজে নিতাম। কাম করতাম। ভরসা হত!' কম্‌লা একটু থেমে বললো, 'ইজ্জত দিয়ে কাম করতে নারলাম। শেষ চলে এলাম জেতের মানুষের কাছে।'

হট্‌লগরের মন সত্যি সত্যিই নরম হয়ে যাচ্ছে। আহা, একলা মেয়েলোক! বললো, 'তোদের তালুকের নাম কি বটে?'

'পাথরডাঙা।'

'পাথরডাঙা!'

যে অঞ্চল ছেড়ে চলে যাচ্ছে দলকে দল—মেয়ে মরদ, আর তাই দেখে দেখে ক্ষেপে গেছে হট্‌লগর—কম্‌লা ফিরে চলেছে সেই অঞ্চলে! মনে মনে

থমকে যায় হট্‌লগর। চুপ করে যায়। কি বলবে ভেবে পায় না। অথচ কিছু একটা বলার জন্যে মনে মনে সে আকুপাকু করে। তারপর বলে ফেলে :

'যাসনি।'

'কেন?'

পাথরডাঙার খবর বললো হট্‌লগর।

'তবে?' চোখ-ভরা প্রশ্ন নিয়ে কম্‌লা তাকিয়ে রইলো হট্‌লগরের মুখের দিকে।

হট্‌লগর চুপ।

ভাত হয়ে গেছে। সূর্য ঢলে পড়েছে মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে। মাটির উপরে শালপাতা পেড়ে বসলো হট্‌লগর। কম্‌লা বললো, 'মোর ভাইটাকে শুধু অল্প করে দুটি দিয়ে দাও।'

'দিয়ে দে না তুই। মোকেও দে—তুইও দুটি খা।'

দু-দিনের না-খাওয়া মানুষ অনেক খাবে বলে এই কিছুক্ষণ আগেই গর্‌গর্‌ করেছে হট্‌লগর। তাই, যদি দিতেই হয়তো তার ভাত-ডাল সেই ভাগ করে দিক। কম্‌লা দেবে না কিছুতেই। তফাতে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুটা সংকোচে—কিছুটা লজ্জায়। অগত্যা উঠলো হট্‌লগর। খেতে বসলো তিন ভাগ করে।

খেতে খেতে কিন্তু ওরা কথা বলে বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর মতো। ভালো লাগছে হট্‌লগরের।

কম্‌লা জিজ্ঞেস করলো, 'ঘরে রেঁধে দেয় কে?'

'নিজেই রাঁধি।'

'বহিন, মা—কেউ নাই?'

'না।'

'তবে তো বড় কষ্ট। তোমার জমি, ঘর, গাড়ী, গোরু সব আছে—শুধু একটা মেয়ালোক নাই। বেশ শক্ত, কাজের মেয়া দেখে সাদি কর মাতবর।'

'হুঁ।'

তারপর চুপচাপ কেটে যায় কিছুক্ষণ। দু-জনেই তলিয়ে যায় যেন নিজের কথার মধ্যে।

কমলা বললো, 'আমি যে কি করি!'—বলে সাগ্রহে তাকালো সে হট্‌লগরের মুখের দিকে। হট্‌লগর কিছুই বলে না।

খাওয়া শেষ করে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়েছিল হট্‌লগর। তন্দ্রার মতো এসে গিয়েছিল একটু। চট্ করে ভেঙে গেল সেটুকু। হঠাৎ মনে হলো তার—কড়াই, ঘটি, থালা নিয়ে কমলা গেছে ধুতে—আধমরা সোঁতায়—অনেকক্ষণ। তার ভাইটাকেও দেখা যাচ্ছে না ধারে-পাশে। সব নিয়ে সরে পড়লো না তো মেয়েটা? ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো সে। এগিয়ে গিয়ে তাকালো পোলের নীচে। থমকে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কমলা গা ধুচ্ছে। পরণের কাপড় পড়ে আছে ওপরে—নেমেছে সে আধমরা সোঁতায়। সারা গায়ে জল ছিটোচ্ছে পাখীর মতো। নগ্ন অনাবৃত নিটোল দেহ—হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠছে তার কর্মঠ দেহের পেশীগুলো। উথলে উথলে উঠছে তার যৌবনপুষ্ট দেহ। হট্‌লগর ফিরে এলো গাছতলায়। শুয়ে পড়লো আবার—নিশ্চিন্তে। যাক—মেয়েটা পালায়নি তা হলে। চোখ বুজলো।

হট্‌লগরের থালা-বাসন সাফ করে গা ধুয়ে গাছতলায় ফিরে এলো কমলা। গাড়ীর ভেতরে বাসনগুলো গুছিয়ে রাখলো পরিপাটি করে। হট্‌লগর চোখ বুজেই পড়ে আছে। মুখে, গলায় গাছপালার আড়াল দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে। লোকটা ঘুমুচ্ছে: কমলা দেখলো। ভেজা কাপড় একটা শুকোতে দেওয়া ছিল হট্‌লগরের। এখন শুকিয়ে গেছে। সেটা খুলতে লাগলো কমলা গাছের ঝুরি থেকে। আবার ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো বুকটা

হট্‌লগরের—পিট-পিট করে চেয়ে দেখলো : কাপড়টা পরে বসবে নাকি মেয়েটা অথবা সরে পড়বে নিয়ে! না। কাপড়টা অন্য দিক দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধলো আবার কম্‌লা। হট্‌লগরের মুখের ওপরে এসে-পড়া রোদটুকু বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর কম্‌লা এসে বসলো গাছের তলায়। বসে রইলো চুপ করে। চেয়ে আছে পোড়া প্রান্তরের দিকে, যেন ভাবছে। ওই রকম অথৈ শূন্যের মধ্যে যেন কুল-কিনারা পাচ্ছে না কিছু।

হট্‌লগর চোখ বুজে ভাবতে লাগলো, মেয়েটা জিজ্ঞেস করবে আবার হয়তো—কি করবে সে তাহলে? কোথায় যাবে?

কিন্তু সে আর কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। হট্‌লগর উঠে জিনিস-পত্র গুছলো, হিসেব করলো। সব ঠিক আছে।

কম্‌লা ঝুরি থেকে কাপড়টা খুলে গুছিয়ে এনে দিল। বললো, 'তুমার কাপড়।'

ঠিক। ভুলে গেছলো হট্‌লগর।

নাঃ, মেয়েটা ভালোই! খারাপ মতলব নাই।

সূর্য ঢলে পড়েছে একেবারে পশ্চিম দিগন্তে। ট্রেন আসবার সময় হলো। হট্‌লগর গোরু দুটোকে আস্তে আস্তে জোয়ালে বাঁধলো একে একে। তারপর শেষ চারদিকে একবার চোখ চারিয়ে দেখে নিল—কিছু পড়ে রইলো কি-না। আর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো মনে মনে।

এমন সময় মেয়েটা কথা কয়ে উঠলো আবার :

'চল্যে যাই আবার খড়গপুরে—না হয় খাদে। যা হয় হবেক।'—

ভাইটা ঘেঁষে বসেছে আবার দিদির পাশে। হট্‌লগর চুপ করে দেখলো দু-জনকে। বললো আস্তে আস্তে, 'ভগমান করুক, তোর ভাল কাম জুটে যাক একটা।'—তারপর চুপ করে গেল। আর কি বলবে সে একটা শুভেচ্ছা

জানানো ছাড়া? জিভে চুক্-চুক্ করে শব্দ করলো: গোরু দুটো চলতে সুরু করলো। দু-পা এগিয়ে হট্‌লগর মুখ ফিরিয়ে বললো আবার :

'যাই আমি। রেল গাড়ী এসে পড়বেক।'—

হট্‌লগরের গাড়ী চলতে সুরু করলো স্টেশনমুখো। আরও একবার পেছন ফিরে তাকালো হট্‌লগর কিছুটা গিয়ে। কম্‌লা আর তার ভাই চলতে সুরু করেছে পুবমুখো। খড়গপুর।—ক্লান্ত, মন্থর।

না—গোরু দুটোকে আর পেটায় না সে ক্ষেপে। সে-ও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গোরু দুটো গাড়ীটাকে টেনে নিয়ে চলেছে টিকিয়ে টিকিয়ে। হট্‌লগর চেয়ে আছে তীব্র চোখে রেল লাইনের দিকে। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে যেন অনেক দূরে।

লালাজী আসবে। তার মনিব।

শহরে মাল করতে গেছে—ফিরে আসবে মাতোয়ারা হয়ে। সুতো আর কাপড়ের মস্ত কারবার তার। কারবার থেকে হয়েছে তালুক-জমিদারী, ফাঁপাই মহাজনী। শহর থেকে ফিরে আসে মদে চুর হয়ে—গাড়ীতে বসে আরও মাতোয়ারা হয়। স্টেশন ঘেঁষা কস্‌বী গ্যাঙ-এর বুনো টঙগুলো থেকে টেনে নিয়ে আসে নাগপুরী হাঘরেদের কোনো একটা বেপরোয়া যুবতী মেয়েকে—গোরুর গাড়ীতে চলে ফুর্তি করতে করতে। আর দরাজ হাতে মদের বোতল উপুড় ক'রে দেয় মাঝে মাঝে হট্‌লগরের আঁজলাতেও :

'পিয়ো—তোম ভি পিয়ো বেটা।'

তারপর জড়িত কণ্ঠে দিল্‌দরিয়াভাবে হট্‌লগরকে ফি-বারই দানপত্র করে দেয় পাঁচ বিঘা জলজমি, বাস্তু, এই গাড়ী, গোরু—মায় সাদি পর্যন্ত। কখনো বা অপুত্রক লালাজীর একমাত্র ধর্মপুত্র হওয়ার আশ্বাস :

'দিল যব খুল যায় রূপেয়া পইসা ক্যা চিজ হট্‌লগর!'

সেই লালাজীর জন্যে ওৎ পেতে অপেক্ষা করে আজ হট্‌লগর। ট্রেন আসছে না। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে আজ।

ট্রেন এলো। গোধূলির আকাশ তখন কালো হয়ে এসেছে। যথারীতি মাতোয়ারা হয়ে গোরুর গাড়ীতে এসে উঠলো লালাজী—সঙ্গে হাবরেদের মেয়ে পুন্নি। লালাজী ঢলানো গলায় বললো, 'চল বে হট্‌লগর।'

'আমি যাবনি। লিয়ে যা তোর গাড়ী। আমি চলে যাব।' গোঁয়ারের মতো বলে উঠলো হট্‌লগর সহসা। বহুদিন পরে।

'আহ্‌হা! গোসা হৈল হট্‌লগর। কেয়া হুয়া?'

'ঝুটমুট বাত বলিস তুই। জমি দিবি বল্লি, গোরু দিবি, ঘর দিবি, সাদি—'

'আহ হা! লে লে, মেজাজ ঠাণ্ডা কর বেটা। সব দিব। দিল্ যব খুল যায়—' বলে একটা মদের বোতলই গুঁজে দিল লালাজী হট্‌লগরের হাতে, 'পিয়ো।'

ক্ষেপে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বোতলটা হঠাৎ হট্‌লগর। বললো, 'ঝুটমুট বাত। মোর বাপকে বলেছিলি এই বাত—মোকে বলছিস দেড়কুড়ি দু-বছর ধরে।'

তার রাগ আর কথা শুনে খিক্-খিক্ করে হেসে উঠলো পুন্নি। ঢলে পড়লো লালাজীর গায়ে, 'হায় লালাজী!'

লালাজীর চোখের ইঙ্গিতে মেয়েটা তারপর ঢলে আসে হট্‌লগরের দিকে—দু-হাত মেলে। মাতোয়ারা হয়ে গেছে মেয়েটা। হঠাৎ হট্‌লগরের ক্ষেপে-যাওয়া ধাক্কায় ছিটকে পড়লো এসে আবার লালাজীর কোলের ওপরে। হাউমাউ ক'রে উঠলো অন্ধকারে।

লালাজী ভয়ে ভয়ে তাকালো হট্‌লগরের দিকে। ক্ষেপে গেছে। ফুঁসে

উঠেছে বত্রিস বছরের অপেক্ষমান শান্ত মানুষটা বুনো ভঁইসের মতো।
'ঝুট বলিয়েছিস তু মোকে—ঝুটমুট।'

লালাজী পুন্নির আড়ালে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো হঠাৎ: ভঁইসটা এগিয়ে আসছে।

তারপর কি ভেবে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলে সে রাগে গর্-গর্ করতে করতে। সিধে—পুব মুখো।

কতদূর যেতে পারে—কতদূরই বা গেছে সেই মেয়েটা: যার একটা মরদ দরকার, সাহস দরকার—সঙ্গী দরকার তার একলা মেয়েলোকের জীবনে! …

সখা

'লগর মাঝির সঙ্গে তোমার সাদি হবে!' বন্‌শী সকৌতুকে বললে, 'তবে যে তুমি হলে মোর সয়া। লগর যে মোর সাঙাৎ ছিল!'

মংলা কেমন অন্যমনে বললে, 'সে-কথার পর চার-পাঁচ বছর কেটে গেল।'

'লগর এখন কোথায়?'

'সে তো চলে গেল কয়লা খাদে।' মরা গলায় আস্তে আস্তে বলে মংলা, 'হঠাৎ একদিন চলে গেল ক্ষেপে।'

'তারপর?'

'তারপর চার-পাঁচ বচ্ছর কেটে গেছে।'

'মন খারাপ কোরোনি হে সয়া—সে আসবে।' বন্‌শী লগর মাঝির কথা বলে, 'ছোট যখন ছিলম—মহিষের পাল লিয়ে চরাতে আসতম জংগলের ধারে ডাহীতে, সে-ও আসতো। মোরা লাচতম, গাইতম, বাঁশী বাজাতম। শালবনে ফুল পাড়তম মহুয়ার। সে-সব দিন মনে পড়ে যাচ্ছে হে সয়া।'

মংলা কিন্তু আর কোনো কথা বললো না। চুপ ক'রে রইলো দূরের দিগন্ত-ছোঁয়া প্রান্তরের দিকে চেয়ে। তার উজ্জ্বল কালো চোখে ওই শূন্য প্রান্তরের শূন্যতা বুঝি প্রতিবিম্বিত হয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে! তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললো, 'সেদিন উড়ে পুড়ে গেছে। জংগল লিয়েছে জমিদার, গোচর ডাহী

গিয়েছে কাগজের কল। জমিন গেছে, গো-মহিষ গেছে, সুখ গেছে—শান্তি গেছে হে বিদেশী। আমি এখন কাগজ কলের ঘাস কেটে মরি—আর তুমি গাঁ ছেড়ে আজ লুকিয়ে আছ মোর ঘরে।'

'হাঁ—আছি। কিন্তু চিরদিন কি লুকিয়ে থাকবো সয়া? আবার ঘুরে আসবে সেদিন।'

'কি জানি বিদেশী!'—

'মোকে তুমি এখনো বিদেশী বলেই ডাকবে সয়া?'

মংলা হেসে বললে, 'তুমি তো তাই বলেছিলে একদিন মাঝি।'

'আজ তো একটা সম্পর্ক বেরিয়ে পড়লো সয়া।'

হঠাৎ একটু বিষণ্ণ লাগে মংলার মুখটা। তবু মুখে একটু হাসি টেনে এনে বললো, 'যাই গরম জল আনি, তোমার ঘা ধুয়ে দিতে হবে।'

ঘুরে এলো খানিক বাদে মংলা গরম জল নিয়ে—পায়ের ঘা ধুতে বসলো বন্‌শীর। বন্‌শী নিজের ঘায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে বললো, 'শালাদের গুলীটা ভাগ্যে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে! না হলে পচে মরতে হতো তোমার ঘরে।'

মংলা কোনো কথা বললো না—মুখ নীচু ক'রে এক-মনে জলের ছিটে দিয়ে ঘা ধুতে লাগলো।

বন্‌শী ফের বললে, 'সেরে এসেছে—না কি বল?'

মংলা অন্যমনে শুধু বললে, 'হুঁ।'

হঠাৎ বন্‌শী মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো, 'আস্তে আস্তে—আস্তে হে সয়া।'

মংলা বোধ হয় নিঃশব্দে একটু ফিক্ ক'রে হেসে ফেলেছিল। বন্‌শী বললে, 'হাসলে যে—।'

'এমনি।' মংলা মুখটা আরও গোঁজ ক'রে ঘা ধুতে লাগলো।

'এমনি হাসলে?'

মংলা আর কোন কথা বললে না। এমনি সে হাসেনি ঠিক—ভাবছিল, এই

লোকটাকে প্রথম যেদিন সে আবিষ্কার করলো তার জ্বালানীর মাচার মধ্যে সেদিনকের কথা। ঠ্যাংটা দেখা যাচ্ছিল শুধু—আর এক জায়গা থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল মাটিতে। মনে হবে বুঝি—ওই রকম একটা ঠ্যাং কে যেন জ্বালানীর মধ্যে কেটে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

চম্‌কে উঠেছিল—ঠিক ভয় পায়নি মংলা। নিঃশব্দে ঘুরে গিয়ে চাল থেকে টাঙিটা নামিয়ে ফিরে এসে বলেছিল, 'কে ঢুকেছিস বটে—বেরিয়ে আয়, না হলে দিলাম ঠ্যাং কেটে।'

প্রথমে ঠ্যাংটা নড়েও না, চড়েও না।

'তবে দিলম টাঙির কোপ।'—মংলা ধমকেছিল।

একটা জোয়ান মরদ বেরিয়ে এলো তারপর—তার জাতের মানুষ, শুধু মাথায় নেই যা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বেরিয়ে এলো ঠ্যাং ঘষটে ঘষটে। তারও হাতে টাঙি।

'কে তুই বটে!'

'চিনবেনি মোকে। আমি বিদেশী।'

'বিদেশী! কুঁন গাঁয়ের লোক বটে হে!'

লোকটা মংলার কুঁড়ের পেছনের জংগলটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'জংগলের ওপার—গিরধিনি।'

'তো মোর মাচার মধ্যে ঢুকলি ক্যানে?'

লোকটা অক্লেশে বললে, 'রাতটা থাকতম।'

'আর দিন এখনও শেষ হয়নি। ঢুকেচিস এসে মোর মাচার মধ্যে!' মংলা ছেঁদো কথায় ভুলবার মেয়ে নয়। বাপ মরে যাওয়ার পর একা সে ঘর করছে। উনিশ কুড়ি বছরের গাঁট্টা-গোট্টা জোয়ান সাঁওতাল মেয়ে। বলেছিল, 'কে তুই বল ঠিক্-ঠিক্।'

'বিদেশীর নাম জেনে কি হবে। রাতটুকু তো শুধু মাথা গুজে থাকতম।'—

'মোর মাচার মধ্যে ঢুকবি আর নাম বলবিনি! গিরবিনির লোক তো ই দিকে এসেছিস ক্যানে।'

'এই—কাঠ কাটতে।'

'হুঁ! তোদের জমিদার জংগল কেড়ে লেয়নি?'

'লিয়েছে। তাই তো বেরিয়ে পড়েছি।'

'তো মোদেরও তো লিয়েছে।'

'তবে চাষের জমিন পাই যদি'—

'জমিন! হোই দ্যাখ—বাবুই ঘাস। কাগজ কলের মালিক গোচর ডাঙী আর ধানী জমি সব কেড়ে লিয়ে ঘাসের চাষ করছে।'

'মোদেরও তাই।'

'তবে! সব জেনে শুনে ন্যাকামী করছিস ক্যানে তবে?'

এত জেরাতেও এতটুকু ঘাবড়াচ্ছে না লোকটা। তার এত্তার মিছে কথা যে বুঝতে পারছিল না মংলা তা নয়। তবে মনে মনে নিজেও সে বিব্রত হয়ে পড়েছিল—কি করবে সে লোকটাকে নিয়ে।

লোকটা আরও বললে, 'আজ রাতটা মোকে থাকতে দিলে ভোর ভোর আমি চলে যাব। পায়ে বরায় দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। বড় ব্যথা হচ্ছে।'

'হুঁ! কুথায় ছিল বরা?'

'বনে।'

'বনে! সত্যি কথা বল—কুথায় দেখেছি তোকে। ঠিক দেখেচি মনে হচ্ছে।' মংলা পাকড়াও করেছিল শেষ পর্যন্ত।

লোকটা হেসে বলেছিল, 'কুথায় দেখবে মোকে! আমি বিদেশী। তোমার দাওয়ায় পড়ে থাকতে দাও শুধু রাতটা—ভোর ভোর যেখানে হোক চলে যাব। আমি তোমার জাতের লোক—দুঃখী লোক। মোকে অবিশ্বাস কোরোনি। ভয় কোরোনি।'

'আরে দূর! তোকে ভয়!' ঠোঁট বেঁকিয়ে মংলা বলেছিল, 'তবে থাক গে যা—হোই চ্যাটাই পাতা আছে দাওয়ায়।'

'চ্যাটাই-মেটাই মোর দরকার নাই—হোই জ্বালানীর মাচাং-এ থেকে যাব।'

'হুঁ! লুকাতে চাস? তুই ঠিক চোরাই হাঁড়িয়া চোলাই করতিস—পুলিস তোকে তাড়া করেছে।'

'তাই যদি হয়। জেতের লোককে পুলিসে ধরিয়ে দিবে?'

নাঃ—লোকটা অসম্ভব! — তাকে আপাদমস্তক একবার যাচাই করে দেখেছিল মংলা চোখ কুঁচকে। তারপর বলেছিল, 'নাঃ—পুলিস বড় হারাম। মোদের বন্‌শী মাঝিকে ধরবে বলে তল্লাট চুঁড়ে ফেলছে।'

'বন্‌শী মাঝিটা আবার কে হে!'

'দূর ভূত কুথাকার! তার নামও শুনিস নাই?' মংলা অবাক হয়ে বলেছিল, 'সে বড় ভালো চ্যাংড়া হে।'

'তবে ভালো। আমি বিদেশী—মোর অতো কথায় কাজ কি!'

'কাজ কি!' মংলা রুখে বলেছিল, 'এই যে মোদের বন কেড়ে লিলে, ডাহী জমিন সব কেড়ে লিলে, মোদের মরদগুলান বিদেশে পালালো—তা ঘুরোৎ চাস না?'

'চাই তো। কিন্তু দেয় কে!'

'বন্‌শী মাঝি বলে—সব আবার একদিন ঘুরোৎ হবে। মোরা লড়াই ক'রে কেড়ে লেব!'

'তো লে।' লোকটি বলেছিল গা ছেড়ে, 'আমি কি না বলছি।'

তার এই গা ছাড়া জবাবে মংলা আবার গাল দিয়ে বলেছিল, 'বিদেশী ভূত!' — রাতের বেলা সেই বিদেশী ভূতটাকে বাইরের ঘুপটি দাওয়ায় একটা চ্যাটাই পেতে শুতে দিয়েছিল মংলা, নিজে শুয়েছিল কুঁড়ের ভেতরে, বাঁশের

দরোজায় ভালো ক'রে খিল এঁটে। কে জানে শয়তান বিদেশীটার মনে কি আছে!

হঠাৎ ঘোর রাত্তির বেলা বন্ধ দরোজায় ঘা। আর চাপা গলায় ডাক :

'আহে—আহে—আহে।'—

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় লেগেছিল বৈ কি মংলার—কে জানে কি মতলবে ডাকছে লোকটা। দম বন্ধ ক'রে বলেছিল, 'শয়তানীর মতলব থাকলে কেটে ফেলাব একেবারে।'

লোকটা ককিয়ে ককিয়ে বলেছিল, 'না গো—একটু জল দিতে পারো? ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

হাতে টাঙি নিয়ে দরজা খুলেছিল মংলা। দেখে—লোকটা 'হুঁ-হুঁ' করছে। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি হলো তোর।'

'জ্বর। বড় তেষ্টা। আর মোর জখম পা-টা যেন খসে যাচ্ছে হে।'

দেখতে দেখতে পাটা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

অতএব ভোর ভোর যে বিদেশীর চলে যাওয়ার কথা ছিল, তা আর হলো না। অধিকন্তু লোকটার ফাই-ফরমাস খাটতে হলো মংলাকে। সেদিন ঘাস কাটতে যাওয়া হলো না আর। লোকটা বললে, 'যাবে একবার পিয়ার ডোবা গাঁয়ে—মোর কুটুম আছে, গুরাই মাঝি। তাকে বলবে যেয়ে শুধু—তোর মামাতো ভাইয়ের অসুখ। দেখবে—ই খবর আর কারুকে দিবেনি।'

কি করে মংলা আর—যেতে হলো। বিদেশী লোক, বিপদে পড়ে গেছে। লোকটার কি রহস্য আছে কে জানে; তবে আছেই কিছু!

গুরাই আর একটি ছোকরা এলো রাতের অন্ধকারে ঘুপ্‌টি মেরে। দেখে মংলা তো আগুন। বললে, 'কি রকম লোক বটে হে তোমরা। খবর দিলম সকালে—এলে রাতের বেলা! কাহিল হয়ে পড়েছে তোমাদের রুগী!'

বিদেশী বললে, 'চেঁচাওনি হে।'—

মংলা গর্‌গর্‌ করতে করতে চলে গিয়েছিল। তারপর কি সব ফিস-ফাস গুজ-গাজ কথা ওদের হলো অনেক্ষণ ধরে। খানিক বাদে চলে গেল দু'জন—রুগী রইলো পড়ে যেমন যেখানে ছিল। লোক দু'জন চলে যেতেই ছুটে এসেছিল বিদেশীর সামনে মংলা—রাগে নয়, শ্রদ্ধায়—আনন্দে, মর্মজ্বালায় জ্বলে।

'এতক্ষণ বলোনি কেন মোকে—বলোনি কেন! যদি বিপদ হতো!'

'কি বলবো হে?'

'তুমি বন্‌শী মাঝি!'—

'কে বললে?'

'এই যে আমি আড়ি পেতে শুনলাম।'

এবার বিদেশী চুপ।

'সারা দিন তোমাকে আমি দাওয়ায় ফেলে রাখলম!' অনুশোচনায় এবার যেন কান্না পেয়েছিল মংলার। বললে, 'চলো ঘরের ভেতরে'

ঘরের ভেতরে শোয়ার জায়গা ক'রে দিয়ে বন্‌শীকে শুইয়ে দিলে মংলা। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো মুখ নীচু ক'রে—কি যেন ভাবলো একটু। বললো আস্তে আস্তে, 'মোকে ক্ষ্যামা কর।'

বন্‌শী কাৎরে বললে, 'এদিকে পা-টা মোর খসে গেল।'

মংলা আবার বললে, 'কাল থেকে মোর ঘরে তোমার অনেক কষ্ট গেছে।'

'ওসব কিছু না হে।'

'দেখি তোমার পা?' মংলা এতক্ষণে পায়ের ঘা-টা দেখতে দেখতে বললে, 'বন্দুকের গুলী লেগেছিল কাল?'

'কি ক'রে জানলে হে?'

'শুনেছি। সবাই জানে। বন্‌শী মাঝিকে কাল জংগল ঘেরাও ক'রে পুলিস ধরতে গেছলো—পারেনি। কোথায় নাকি পালিয়ে গেছে।' মংলা আবিষ্ট ভাবে বললে, 'কিন্তু সে যে মোর ঘরে!'—

'মোর কথা কারুকে আর বলোনি তো।'

'না। আমি ভাবলাম, হোক বিদেশী—জেতের লোক তো! লোকে জানলে হয়তো কোনো বিপদ আপদ হয়ে যেতে পারে। থাকবে তো একটা রাত মোটে—তো থাক। তাই বলিনি।'

'খুব বুদ্ধি তোমার হে।'

'আমি যাই এখন—রেতের বেলা ঘায়ের পাতা খুঁজে পাই কোথায় দেখি আবার।'

'রাতে থাক না।'

'উঁ হুঁ—খারাপ হতে পারে। ঘায়ের ভেতরে রস ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরে পাতা বসিয়ে দিলে ভেতরে যদি কিছু থাকে তো সব ঠেলে বেরিয়ে যাবে, ফুলা কমে যাবে, দরদ থাকবেনি। আমি যাই।'—

সেই বিদেশী—বন্‌শী মাঝি! দ্বিতীয় দিনে রাতে শোয়ার ব্যবস্থা উলটে গেল। বনশীকে ঘরে দিয়ে দরজা আগলে শুলো মংলা, পাশে টাঙি। শুলো বটে—ঘুম হলো না সারা রাত। বাইরের প্রতিটি শব্দে চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগলো।

বন্‌শী বলেছিল একবার, 'বাইরে শুলে যে তুমি!'

'হাঁ, কেউ এলে রইলম আমি। তুমি ততোক্ষণে ঘরের দেয়াল ভেঙে চলে যেতে পারবে বনের দিকে।'

বন্‌শী মাঝির এত কাণ্ডে হাসবে না মংলা! ঘা এখন সেরে আসছে—আর ক'দিন বাদে দিব্যি চলে বেড়াতে পারবে। খোঁড়া হয়ে যাওয়ার বিপদ কেটে গেছে। প্রথম দিনই পাতা বেঁধে দিলে এতটা হতো না—ঘা পচে উঠে বিষিয়ে উঠতো না। কিন্তু প্রথম দিন লোকটা মাচা থেকে ঘষটে ঘষটে বার হয়ে এসে বললে কি না, 'বিদেশী!'—

ঘা ধুয়ে নতুন ক'রে তাতে কি একটা বুনো পাতা বসিয়ে দিয়ে উঠলো

মংলা। বললো, 'পা এবার সেরে উঠছে মাঝি—কিন্তু খবর্দার, বাইরে বেরিয়োনি।'

কৌতুক ক'রে বন্‌শী বললে, 'কোথায় যাব আর সয়া, অমন শুইয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে! মংলার ই ঘরের কোণ ছেড়ে কোথাও যেতে আর মন নাই।'—

'মনে রইলো মাঝি,' বলে নিজের একটা আবেগ চাপবার জন্যে তাড়া তাড়ি উছলানো মুখটাকে ঘুরিয়ে নিলে মংলা অন্য দিকে। বললে, 'এবার যাই আমি ঘাস কাটতে, দেরি হলে পয়সা কাটবে চোরগুলান।'

দিনের শেষে মংলা সেদিন যখন ঘুরে এলো তখন খোঁপায় তার কৃষ্ণচূড়ার এক থোকা ফুল গোঁজা। এসে দাঁড়ালো বন্‌শীর সামনে—সারা দিনের ক্লান্ত মুখটাও যেন মিষ্টি হাসিতে ভরে আছে। শুধোলে, 'বাইরে বেরোয়নি তো বিদেশী?'

কৌতুক ক'রে বন্‌শী বললে, 'হ্যাঁ—ঘুরে এলম তোমাদের গাঁয়ের বস্তি।'

মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠলো মংলার মুখ।

বন্‌শী হাসলো।

মংলা বললো, 'তুমি তো জান না মাঝি, তোমাকে ধরার জন্যে দু'কুড়ি দশ টাকা দেবে বলে সরকার ঢোল দিয়েছে। যদি কেউ'—মংলা ভয়ে থেমে গেল।

বন্‌শী বললে, 'বলো কি গো সয়া! তবে তুমি খপর দিয়ে এসো সরকারকে, তারপর ওই দু'কুড়ি দশটাকা নিয়ে চলে যাও সাঙাতের কাছে রেলগাড়ীতে চেপে।'

'ই কথা তুমি বললে মাঝি!' মংলা ভারি চোখ তুলে তাকালো একদৃষ্টে বন্‌শীর দিকে।

বন্‌শী হেসে উঠলো। বললো, 'আচ্ছা, মোর কথা না হয় ঘুরোৎ দাও। যেয়োনি তুমি। কিন্তু সয়া, মাথায় ফুল দিয়েছ! মুখ-চোখ কেমন ধারা! আজ ঠিক মোর সাঙাতের কথা মনে পড়েছে তোমার।'

মুখ চোখ ভারী হয়ে উঠলো মংলার—বন্‌শীর সামনে দাঁড়াতে যেন আর সে পারছে না। যাওয়ার সময় বলে গেল শুধু, 'সে মোর কাছে মরে গেছে।'

ডেকে আর হাল্‌কা কথার জের টানতে সাহস হলো না বন্‌শীর। মংলা বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারে। তারপর খোঁপার ফুল গুলো টেনে কি ভেবে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সহসা কেন যে তার মনে হলো—ফুলের তার আর দরকার নেই।

দাঁড়িয়েছিল সে একভাবে, এমন সময় সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো একজন সাঁওতাল আধ বুড়ো। বললে, 'বলো বন্‌ মাঝিকে—পিয়াশাল থেকে এসেছি।'

মংলা বললে, 'চলে যাও ঘরের ভিতরে।'

কিছুক্ষণ বাদে আবার একটি লোক বেরিয়ে এলো বনের ভেতর থেকে ঘুপ্‌টি মেরে। বললে, 'শালবোনি থেকে এসেছি—বন্‌ মাঝিকে বলো।'

এমনি ক'রে লোক এলো আরও কয়েকজন—গোদা পিয়াশাল, শাল-বোনি, পিয়ারডোবা, কালিপাথ্‌রী, চন্দ্রকোণা। জমায়েত হলো এসে একে একে। এমনি হয় এক-একদিন। বিরাট এক পাহাড়ী জংগলের কিনার ঘিরে আদিবাসী এলাকা—লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত, দরিদ্র। গম্‌গম্‌ করছে বুকের মধ্যে আরণ্যক জীবন—আগুন জ্বলে ওঠার আগে গুমরে মরা ধোঁয়ার মতো। সেই অসন্তুষ্ট ঘূর্ণাবেগ ধোঁয়ার তালে যেন ঘর ভরে যায় মংলার। সেদিন অনেক কি সব শলা-পরামর্শ ক'রে ওরা চলে গেল একে একে রাত যখন গভীর হলো।

মংলা এতক্ষণ বসেছিল দাওয়ায়—এক কোণে। এ সব কথার মাঝখানে বন্‌শী মাঝি ডাকে না তাকে, বরং কথার ছলে যেন সরিয়ে দেয়। হয়তো কোনো গোপন কথা হয়। রাগ হয়, অভিমান হয় মংলার—তারই ঘরে লুকিয়ে থেকে বন্‌শী মাঝি তাকে বিশ্বাস করে না!

সেদিন সবাই চলে যাওয়ার পর মংলা উঠি উঠি করছিল ঘরের ভেতর যাবে বলে—এমন সময় চমকে উঠে দেখে, থপ্ থপ্ ক'রে খোঁড়া পা টেনে স্বয়ং বন্‌শী মাঝিই এসে হাজির বাইরের দাওয়ায়।

'সয়া!'—

মংলা তাড়াতাড়ি তার সামনে ছুটে এসে দাঁড়ালো।

বন্‌শী মাঝি দুটো হাত মুঠো ক'রে ধরলো তার। বলে উঠলো, 'তুমিই মোর খাঁটি সয়া। মুখ ফুটে বলতে হয় না কিছু—প্রাণের কথা আপনি বুঝে লাও।'

'কি হলো মাঝি?' মংলা ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাকালো বন্‌শীর মুখের দিকে।

'কি হলো সয়া! এত কাণ্ড করছো তলায় তলায়—বলোনি তো মোকে একদিনও!'

'কি করলম মাঝি!'

'এর মধ্যে একদিন চন্দ্রকোণা গেছলে?'

'গেছলম মাঝি।'

'সেখানে বলে এসেছ—এ গাঁয়ের তোমরাও যাবে জংগলের দখল নিতে?'

'হ্যাঁ মাঝি।'

'এর মধ্যে কবে ঘাস কাটার মজুরী বাড়ানোর জন্যে দু-দিন কাজ বন্ধ করেছিলে?'

'করেছিলম মাঝি।'

'সবাই তোমার কথা শোনে?'

'কথাটা যে সকলের মাঝি।'

'এসব কথা নিয়ে মোর সঙ্গে তো শলা-পরামর্শ করোনি কোনো দিন!'

'তোমাদের শলা-পরামর্শে মোকে তো ডাকনি কোনো দিন মাঝি।'

'মোর ঘাট হয়েছে সয়া। আর একটা কথা, আমি তোমার ঘরে আছি—এখানে তোমাদের সবাই কি তা জানে?'

'তা জানে না।'

'কি বলেছ তাদের?'

'বলেছি—ফেরার। বলেছি—লুকিয়ে আছে। আর বলেছি, চিরকাল কি সে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবে—দিনের আলোর মুখ দেখবেনি!'

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলো বনশী—অন্ধকারেও যে উদ্দীপ্ত আবেগ ঢাকা পড়ে না সেই স্ফুরিত আবেগ কেঁপে উঠতে শুনলো তার গলায়, ঝলকে উঠতে দেখলো তার চোখে। এই মেয়েটা কোথায় কোন গাঁয়ে গাঁয়ে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছে একা, গেছে চন্দ্রকোণার মাতব্বরদের কাছে লুকিয়ে, একজোট করেছে তাদের মেয়ে মরদকে—কিছুই জানায়নি তাকে। মেয়েটাকে হঠাৎ মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে করে বনশীর।

বনশী মংলার কথার জের টেনে আস্তে আস্তে বললো, 'ঠিক—অন্ধকার চিরদিন থাকবেনি সয়া—সবাই মোরা আলোর মুখ দেখবো।' তারপর হঠাৎ চোখ পড়লো বনশীর, মংলার খোঁপায় কৃষ্ণচূড়ার থোকাটা তো নেই। বনশী বলে উঠলো, 'তোমার মাথার ফুল গেল কোথায় সয়া?'

মেয়েটা কেঁপে উঠলো যেন সহসা। বললো, 'ফেলে দিয়েছি।'

'কেন সয়া! বহুদিন পরে ফুল দিয়েছিলে—আমি এসে দেখিনি আর কোনোদিন।'

মংলা কোন জবাব দিল না সে কথার। বনশীর কোমরটা শক্ত ক'রে চেপে ধরে বললে, 'চল—ঘরে চল মাঝি, কাঁধে ভর দিয়ে চল মোর। লাঠি ছেড়ে হাঁটা তোমার উচিত হয়নি।'

বনশী বললে, 'সকলের মুখে তোমার কথা শুনে লাঠির কথা ভুলে গেলাম সয়া। মনে হলো—লাফ দিয়ে আজ ছুটে যেতে পারি।'

'চুপ করো মাঝি।'—

মংলার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বন্‌শী বললো, 'না হে সয়া—কথা বলতে দাও। তোমার দিকে চেয়ে কথা বলতে দাও আজ। চুপ তো অনেকদিনই করে ছিলাম—বাপ ঠাকুদ্দা পাথরের চাঙা কেটে কেটে ধানের জমি করেছিল—সেখানে মোরা উঠবন্দী চাষী, উঠ বললে যা চলে কোথায় যাবি! বনের লোক মোরা বনে ছিলাম, কাঠ কাঠতম—ফুল পাড়তম মহুয়ার, খেতম তাই বেচে। তাও কেড়েকুড়ে ব্যবসা করছে খোট্টা জমিদার। গোচর ডাহীতে গোরু মোষ চরাতম—তাও কেড়ে লিয়ে বাবুই ঘাসের চাষ করলো কাগজ-কলের মালিক আর পাশে খুলে দিল গোরু-ধরা খোঁয়াড়। গোরু ধরে ধরে গোরু সব নিলাম করে লিলে। চুপ করে করে ফৌত হয়ে গেল গরীব বাপ-ঠাকুদ্দা। আর কত চুপ ক'রে থাকতে বলো সয়া!'—

জংগলের মানুষ কথা কয়ে উঠেছে। আশ্চর্য সেই দীপ্তিতে ঝকমক করে ওদের চোখ।

শাল মহুয়ার জংগল ঘেঁষে একটা মরা গাঁয়ের কোণ দেখে যেখানে একদিন গা ঢাকা দিতে এসেছিল বন্‌শী—দেখতে দেখতে সে জায়গাটা নতুন এক প্রাণস্পর্শে যেন নড়ে চড়ে উঠলো। অরণ্যের লুকানো আগুন ধুঁইয়ে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে শুদ্ধ অসন্তোষের মাঝখানে।

তারপর সে আগুন জ্বলে উঠলো একদিন।

কাজে বেরোবার আগে মংলা বন্‌শীর পায়ের ঘা ধুতে বসেছিল—এমন সময় একটি মেয়ে ছুটে এলো হাউমাউ ক'রে।

'মোদের সব গোরু চালান ক'রে দিলে শয়তানরা গো দিদি—সব কটা গোরু।'

মংলা চকিতে মুখ তুলে তাকালো।

'ঘাসে মুখ দেয় নাই—কিছু না।' মেয়েটি হাত কচলাতে কচলাতে অসহ্য গলায় বললে, 'চরাতে যাচ্ছিলম—জবরদস্তি ধরে খোঁয়াড়ে লিয়ে গেল হাসতে হাসতে।'

চোখে চোখে তাকালো মংলা আর বন্‌শী। নীরবেই বুঝলো ওরা—এ জবরদস্তির মানে কি। এ গাঁয়ের বস্তি উজাড় ক'রে চলে গেল সব গোরু, মোটা মুনাফা লুটবে ঘাস-ক্ষেতের থোট্টা মালিক, মুনাফা লুটবে সরকারী খোঁয়াড়, শুধু ভিটে-মাটি-চাটি হয়ে যাবে এ গাঁয়ের মানুষগুলোর। চালান হয়ে যাবে গোরুগুলো কোথায় না কোথায়—গোরু বিকোবে গোস্ত হয়ে।

মংলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। বন্‌শীর ঘায়ের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'ঘা প্রায় সেরেই গেছে মাঝি—কিন্তু হাঁটার লোভে ঘরের বার হয়ে পড়বে না যেন। আমি যাচ্ছি—সাবধানে থাকবে। বেশী হাঁটা হাঁটি'—বলে বন্‌শীর স্তব্ধ শুকনো চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেল মেয়েটা। সেখানে নিঃশব্দ ভৎ'সনা। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল।

'মোদের মরদগুলান কোথায়?'

'কাজে চলে গেল।' মেয়েটা ক্রোধে ক্ষোভে কেঁদে ফেললে।

ওরা চলে গেল।

বন্‌শী বসে রইলো কান পেতে। ওর চোখে চাপা ঔৎসুক্য। অনেক্ষণ পরে শুনতে পেলে সে একটা হাল্লা—গোলমাল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে এসে দাঁড়ালো বন্‌শী। দূর থেকে শুধু হাল্লাটাই শোনা যায়—এখানকার নিশঃব্দ আকাশের শূন্যতা শিউরে উঠছে তাতে ক্ষণে ক্ষণে। আর কিছু বোঝবার উপায় নেই। বন্‌শী খোঁড়া পা টেনে টেনে অস্থির ভাবে পায়চারী করতে লাগলো শুধু।

এক সময়ে গোধূলি নামলো অরণ্য প্রান্তে। বন্‌শী সাগ্রহে চোখ মেলে আছে ঘর মুখো গোরু-ভঁইসের ডাক শোনবার জন্যে। কিন্তু চমকে উঠলো সে ধোঁয়ার তাল দেখে। সেগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশে—হাওয়ায়, গোরু মহিষের বুক ফাটা আর্তনাদ, মানুষের হাল্লা। বাঁশ ফাটার শব্দ।...

এমন সময় মংলা এলো ছুটতে ছুটতে—সারা দিনের ক্লান্ত কঠিন মুখ ধূলি-ধূসর। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'শয়তানগুলান খোঁয়াড়ে আগুন লাগিয়ে দিলে মাঝি। মোরা সবাই গোরুর জন্যে ক্ষেতের কাজ বন্ধ ক'রে বসেছিলাম। ওরা আগুন লাগিয়ে দিলে।' ক্ষোভে, ব্যর্থতায় যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো ওর শুকনো চোখ থেকে।

বন্‌শী তাকিয়ে আছে স্তব্ধ চোখে।

মংলা বললে, 'এবার তুমি পালাও মাঝি। হারামীরা পুলিস ডাকবে। পালাও তুমি—না হলে ধরা পড়ে যাবে।'

'চলে যাব বলছো ?'

'হাঁ। আজই পালাও।'

'তাই ভালো। চলে যাই তবে জংগলের ওপার।'

'কিন্তু তোমার পা যে এখনও ভালো করে সারেনি মাঝি !—'

'ও ঠিক আছে সয়া। চলে যাব। ভাবছি শুধু, তোমাদের বনের ধারের মাত্‌লা নদীটা পার হবো কি করে! অথচ জংগলের ভেতর দিয়ে গেলে ভালো হয়।'

মংলা বললে, 'কলার মান্দাস করে দিব—ভেবোনি মাঝি।'

চললো পালাবার তোড়জোড়। সন্ধ্যের অন্ধকারে কলাগাছ কেটে ভেলা তৈরী ক'রে লুকিয়ে রেখে এলো মংলা ঝাঁটি বনের ভেতরে। বন্‌শীর নির্দেশ মতো বাঁশের মোটা একটা লাঠি কেটে রাখলে। কয়েকজনকে পাহারায় রাখলে দূরে দূরে। বন্‌শীর সঙ্গে দেওয়ার জন্যে বাঁধলো ছোট ছোট

গুটি দুই পুঁটলি। আর সারা সন্ধ্যেটা কেবলি মনে হতে লাগলো তার—একটি লোক আজ চলে যাবে।

রাত যখন গভীর হলো তখন ডাকলো মংলা :

'মাঝি!'

গলার স্বরটা বড় ভারী লাগে কানে। বন্‌শী মুখ তুলে তাকালো। মনে হলো—মেয়েটা পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। অনেক কাজ করেছে হয়তো।—

পুঁটলি দুটোর দিকে চেয়ে বন্‌শী বললে, 'ই সব কি সয়া!'

'দুটো মুড়ি চিঁড়ে—আর ওটায় আছে গুড়, পাটালী, নারকোল। রাস্তায় খাবে।'

'ই সব করেছ আবার!'

'বনেই যে দু'দিন কেটে যাবে মাঝি!'

'তোমার শুধু এই লাঠিটা ধরে আমি হেঁটে যেতে পারতাম সয়া সারা বন।' বলে বন্‌শী লাঠিটা তুলে নিল।

মংলা পুঁটলি দুটো লাঠিতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো—তাকালে শুকনো চোখে বন্‌শী মাঝির দিকে—কয়েক মুহূর্ত। ফিস ফিস ক'রে বললে, 'যাও মাঝি।'

বন্‌শী পুঁটলি বাঁধা লাঠিটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, 'যাই তবে সয়া। দিনের আলোয় দেখতে আসবো আবার—দিন যেদিন আসবে। আজ পালাচ্ছি অন্ধকারে। ভেবোনি তুমি। আজি জানি, সাঙাৎ মোর একদিন আসবেই—মোদের জংগল যেদিন ঘুরিয়ে লেবো, জমিন যেদিন মোদের হবে। সেদিন কেউ ছেড়ে যাবেনি আর গাঁয়ের মাটি।'

এক দৃষ্টে গভীর কালো চোখ দুটো মেলে চেয়ে রইলো মংলা—পাথর কুঁদো মুখে ঠোঁট দুটো শুধু নড়ে উঠলো একবার—কিন্তু কিছু বললে না।

বন্‌শী দাওয়া থেকে নেমে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল।

সেই দিকে শুকনো চোখ মেলে চেয়েছিল মংলা। হঠাৎ মনে পড়লো, তাই তো—সেই যে বিদেশীর হাতে টাঙিটা ছিল একদিন, সেটা তো দেওয়া হলো না!—

সামনের চালেই গোঁজা ছিল সেটা। তাড়াতাড়ি সেটা পেড়ে নিয়ে ছুটলো সে বনের দিকে। সামনে বন্‌শী যাচ্ছে।

পেছন থেকে ডাকলো মংলা, 'মাঝি!'

বন্‌শী ঘুরে দাঁড়ালো।

মংলা বললে, 'তোমার টাঙি।'—

'টাঙি!' বন্‌শী বললো, 'থাক সয়া ওটা তোমার কাছে। তোমার ছেলে হলে তার হাতে দিয়ে বোলো মোর কথা। বোলো মোর সাঙাৎকে।'

এক মুহূর্তের জন্যে থম্‌কে দাঁড়ালো মংলা। তারপর টাঙিটা নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলো ঘরে। এসে কুঁড়ের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে হু-হু করে কাঁদতে লাগলো উপুড় হয়ে। কেন যে কাঁদলো শুধু সেই জানে।

আস্মা

১

দলের রাতকানা লোকটা জিজ্ঞেস করলে, 'আর কত্‌টা পথ হে?'

'হেঁঃ—রাত দু-পহর তক্ হাঁট শালা এখন—তারপর হাট-চালায় যেয়ে মাথা গুঁজবি।' পাশের জোয়ান মতো ছোকরাটি বললে, 'হাঁট এখন মুখ বুজে।'

কিন্তু মুখ বুজে থাকা তার পক্ষে কঠিন—হোঁচট খাচ্ছে সে পায় পায়, যদিও হাত ধরে চলেছে একজনের। বকে মরছে বিড় বিড় ক'রে। দলের আর সবাই চুপ। মাথায় কাঁধে মোট—পিঠে বোঁচকা, কোনো মেয়ের বোঁচকায় ঘুমন্ত শিশু। দলটিতে প্রায়, মেয়ে মরদ ক'রে জনা দশেক হবে—চলেছে কোনো নতুন হাট-খোলার উদ্দেশে পুরানো কোন হাট-খোলা ছেড়ে। মাথায় পিঠে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে ঘর-সংসার—হাঁড়িকুড়ি কাঁথা চ্যাটাই—মায় টঙ বাঁধার বাঁশ-বাখারিটি পর্যন্ত।

জাতে ওদের বলে 'কাক-মারা'—কোন্ বুনো পূজোর পদ্ধতিতে কাক ধরে ধরে বলি দেয়, কাকের মাংস খায় পরম উল্লাসে। ব্যাধের মতো পাখী শিকার করে—হয়তো বুনো পাখী সব সময় সহজলভ্য নয় বলে সুপ্রচুর কাককুল ওদের পরম ভোজ্য। বেদের মতো ঘুরে বেড়ায় গ্রাম থেকে

গ্রামান্তরে, মাথা গোঁজে হাট-চালার আশেপাশে। গলায় লাল নীল কাঁচের মালা। পুরুষেরা পাখী শিকার করে ভেল্কি ভোজবাজী দেখায়, আর তেড়ে নেশা করে গাঁজাগুলির। মেয়েরা ঝুড়িতে ক'রে বেচতে নিয়ে আসে সস্তা দামের সাবান তেল আয়না ইত্যাদি। গ্রামের গেরস্থ মেয়ে-ভোলানো শৌখীন টুকিটাকি জিনিস, আর নবীন যুবক চাষী ছোকরাদের টান মারে কখনো বা চোখ ঘুরিয়ে। জীবিকার পক্ষে উপযোগী হলে নিজেরা টঙ বাঁধে হাট-খোলার আশেপাশে যতোখানি আগ্রহে, ঠিক ততোখানি ঔদাসীন্যেই আবার হুট ক'রে চলে যায় কবে সব ভেঙে দিয়ে। মাতৃভাষা তেলেগু—কিন্তু দিব্যি কথা বলতে পারে স্থানীয় ভাষায়। কবে ওরা মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন কে জানে—দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলার সীমান্তের অঞ্চল থেকে অঞ্চলে।

দলের রাতকানা লোকটা পড়ে গেল দড়াম ক'রে একেবারে হুমড়ি খেয়ে।

পাশের জোয়ান মতো ছোকরাটি গালাগাল দিয়ে বলে উঠলো, 'শালা গোবনা সাঁঝ-পহর থেকে দড়াম দড়াম ক'রে পড়তে লেগেছে গো।'

শুধু পড়া নয়—এবার গোবনা পড়ে আর উঠছেও না। যার হাত ধরে ধরে যাচ্ছিল সে বলে উঠলো, 'উঠছে না যে গো!'

'মরেছে!'

দল দাঁড়ালো থমকে।

শীতের রাত। চাঁদের আলো নেই। কুয়াশায় সবটা আচ্ছন্ন।

বাগাম্বর বুড়ো ঘোলাটে চোখ তুলে চারদিকে চেয়ে বললে, 'কত্‌খানি এলম বলো দেখি?'

কে একজন বললে, 'নদীচরের জালপাই মহাল এখনও ছাড়াতে পারি নি হে।'

'তবে!'

রাতকানা গোবনা ততক্ষণে উঠেছে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে। বললে, 'পা দুটা মোর বশ থাকছে না কোনো রকমে।'—

পাশের জোয়ান ছোকরাটি খেঁকরে উঠে বললে, 'তবু বলবে না শালা—চোখে দেখতে পায় না।'

বাগাম্বর বললে, 'এক কাজ করা যাক এসো।'

দলের বুড়ো লোকটির কথা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো সবাই।

বাগাম্বর বললে, 'মোদের এক বেটির ঘর এইখেনে—আজ রাতটা থাকি চলো সেখেনে যেয়ে।'

'মোদের বেটি?'—

'হাঁ গো—মোদের জাতের মেয়া। দল ছেড়ে চলে গল একদিন সে একটা উদো চাষীর সঙ্গে। তার ঘর এই জালপাই মহালে।' বাগাম্বর বললে, 'জমিন গোরু ছাগল হাঁস মুরগী—ঘরদোর সব জম্‌জমাট। মেয়াটা মোদের ভারী পয়মন্ত কি-না।'

'কে বলো দিকিন।'

'আন্দি। মোর এক স্যাঙাতের বেটি। চিনবেনি তোমরা।'

'কিন্তু তোমাকে সে চিনবে তো?'

'চিনবেনি! বল কি!' বাগাম্বর এক গাল হেসে বললে, 'মোরা যাই না বলে কত গোসা করে বেটি মোদের। গেলে খাতির করবে কত! আর তার অভাবই বা কি বলো। গোলায় ধান, গোয়ালে গোরু, পুকুরে মাছ।'

ভূতের মতো লোকগুলোর জিভের তলায় জল এসে গেছে ততোক্ষণে, সমস্বরে প্রায় বলে উঠলো সবাই, 'চলো তবে।'

দলটি মোড় ফিরলো উত্তর থেকে পূবে।

রাতকানা গোবনা ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ক'রে চলতে চলতে বললে, 'মোদের জন্যে তা হলে মাছটাছ ধরবে—কি বলো?'

বাগাম্বর বুড়ো বললে, 'অতো রাতে মাছ কি আর ধরবে! তবে হাঁস মুরগী একটা কিছু মারতে পারে।'

মাছ নয়—একেবারে মাংস! কাক খাওয়া তিতকুটে মুখগুলো এক লহমায় যেন সজল হয়ে উঠলো স্বাদে আর গন্ধে। দলের বুড়ো বাগাম্বরের পেছনে পেছনে চলেছে ওরা—হাঁটার গতি গেছে বেড়ে—মায় গোবনার পর্যন্ত।

দলের সামনের একজন বলে উঠলো, 'নতুন হাঁড়ি পড়েছে গো দাদা।'

বাগাম্বর শুধালো, 'শ্মশান?'

'তাই তো দেখি।'

বাগাম্বর বললে, 'এসে পড়েছি তা হলে। শ্মশান পার হয়ে বাঁয়ে বেঁকবে।'

আগের লোকটার চোখ তখনো শ্মশানের মড়াফেলা হাঁড়ির দিকে। বললে, 'অনেক হাঁড়ি গো।'

গোবনা বললে, 'মোর ভাতের হাঁড়ি নাই—একটা বেছে তুলে দে না ভাই হাতে।'

বাগাম্বর বললে, 'সে সব সকালে হবে। এ মস্ত শ্মশান—অনেক হাঁড়ি পাবে, মনের সুখে তখন বাছবে। চলো এখন।'

দু-একজন তবু হাঁড়ির লোভ ছাড়তে পারে না—হাতে তুলে নেয় দু-একটা। ঠন্ ঠন্ ক'রে বাজিয়ে দেখে কানের কাছে—ভালোই আছে। শ্মশানের মড়া ফেলা হাঁড়ি কলসীর জন্যে ওদের ঘৃণাও নেই—ভয় সংকোচও নেই। তাইতে গুষ্টিশুদ্ধ রাঁধে-বাড়ে খায় আর গাছ তলায় শোয়। মরে আর জন্মায় বংশ-পরম্পরায়। এই ওদের জীবন।...

এর মধ্যে ব্যতিক্রম যেন আন্দি—উদো চাষী জগার বিধবা। তিনটে নাবালক ছেলে রেখে সাপ-কাটিতে জগা মরে গেছে। কিন্তু তার জমি-জিরেত ঘর-সংসার অটুট আছে আন্দির কাছে। বলদ হাঁকিয়ে নিজেই সে

চাষ-আবাদ করে একটা জোয়ান মরদের মতো। তিন ছেলের মা কিন্তু এখনও সে ভরাযৌবনা, বেদের মেয়ের নির্ভীকতার সঙ্গে মিশেছে কিসান বউয়ের লক্ষ্মীশ্রী। ঝকঝক তক্‌তক্ করছে ঘরদোর উঠোন দাওয়া।

বাগাম্বরের বুনো 'কাক-মারার' দল সেই উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ-করে চেয়ে রইলো।

বাগাম্বর গলা ফুলিয়ে বললে, 'এই মোদের বেটি-জামায়ের ঘর।'

হঠাৎ অন্ধকারে অতগুলো মানুষের কলকলানি শুনে আন্দি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথাকার লোক বটে গো?'

বাগাম্বর এগিয়ে গিয়ে এক গাল হেসে বললে, 'এলম গো বেটি। কতোদিন ভেবেছি আসবো আসবো—তা আর হয় না। আজ ভাবলম—যাই একবার ঘুরে মোদের বেটি-জামায়ের ঘর। কতদিন যে দেখিনি বেটি তোকে।' বাগাম্বরের গলাটা নরম হয়ে এলো দরদে।

কিন্তু বেটির মুখের তখন দ্রুত ভাবান্তর শুরু হয়েছে! বাগাম্বরের মাথায় গোঁজা কাকের পালক আর গলায় লাল-নীল কাচের মালা দেখেই বুঝেছে আন্দি—উঠোনে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কারা! সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ পড়লো তার জঞ্জাল সাফ-করা ঝাড়ুর।

'যতো বেহায়া নাক-কাটা, ভাগাড়ের হারাম—ঝেঁটিয়ে সাফ করবো আজ। এত দূর দূর করি—তবু লাজসরম নাই!'—

এক লহমায় বুঝে নিল বাগাম্বর—আগেও তা হলে বহু দল তাড়া খেয়ে গেছে। তার নিজের ইজ্জৎ যায় যায় প্রায় তার দলের কাছে। বাগাম্বর হাসি মুখে তবু বললো, 'মোরা তো কখনো আসিনি বেটি।'

'ওরে আমার বাপের ঠাকুর রে!' আন্দি এবার ঝাড়ু ছেড়ে বঁটির খোঁজ করলে।

অন্ধকার উঠোনে অপেক্ষমান দলটির মধ্যে এবার চাঞ্চল্য দেখা গেল।

বাগাম্বর মোলায়েম ক'রে বললে, 'মোরা শুধু রাতটা থাকবো একটু মাথা গুঁজে বেটি—কাছাকাছি কোনো হাট-খোলা নাই যে থাকি। আর এই জাড়ের দিন !—কাল সকালে উঠেই চলে যাবো মোরা।'

'যাবে—নড়বে তোমরা ভাগাড়ের শকুন !' আন্দি সমানে গাল পাড়তে লাগলো, 'যতো বেহায়া পাত-চাটা কুত্তা।'—

বাগাম্বর বললে, 'বেশ—সকালে উঠে না চলে গেলে তখন বলিস। মানে একটা রাতকানা আছে মোদের দলে—বেচারা পড়ে যাচ্ছে শুধু দড়াম দড়াম ক'রে। একটা রাত শুধু বেটি !'—

আন্দি বোধ হয় একটু নরম হলো। তবু গর্‌গর্‌ করতে করতে বললে, 'অতো গুলান লোকের মুখে দেবো কি ছাই। কোথায় পাবো এত রাতে হাঁড়ি-কড়াই।'—

কথার ধারা বদলেছে দেখে দলের মধ্যে হঠাৎ একটা আশার সঞ্চার হলো যেন। গোবনা বলে উঠলো, 'হাঁড়ির অভাব কি গো। এই তো পাশের শ্মশানে কত বড় বড় হাঁড়ি সব গড়াগড়ি যাচ্ছে।'—

আর যাবে কোথায়। যুগপৎ ঝাড়ু বঁটি কাটারি ইত্যাদির ঘন ঘন উল্লেখ ও হুহুংকার একযোগে আন্দিকে উত্তাল ক'রে তুললে। তাকে আর নরম করতে পারে না কোনো রকমে বাগাম্বর। সত্যি সত্যি আন্দি হাতে ঝাটা নিয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র মূর্তিতে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে সে—শ্মশানের হাঁড়ি-নাড়া এ ভূতের দলকে আশ্রয় দিয়ে কেমন ক'রে সে অকল্যাণ ডেকে আনে !

চতুর বাগাম্বর আন্দির সুরে সুর মিলিয়ে গাল পাড়তে লাগলো গোবনাকে, 'তাড়িয়ে দে শালা কানাকে। বেটির মান রাখতে জানে না শালা ছোটলোক।'

শেষ পর্যন্ত রফা হলো—আন্দির দাওয়ায় থাকবে ওরা একটা রাত। ভাত-টাত হবে না, মুড়ি পাবে সবাই চাট্টি চাট্টি। রাত থাকতে থাকতে পালাতে পাবে না কেউ—যাওয়ার সময় ঝোলাঝুলি সব খুলে দেখিয়ে যেতে হবে

আন্দিকে। হাঁস মুরগীর একটা কোনো কিছুতে হাত দেবে তো বেধড়ক্কা ঝাঁটা খাবে সবাই।

মাথা দুলিয়ে তাতেই সায় দিলে বাগাম্বর। তারপর একগাল হেসে হাত বাড়ালো আন্দির বছর তিনেকের ছোট ছেলেটার দিকে, 'এসো দা-দা।'

'ওরে আমার চোদ্দ পুরুষের দাদারে!' আন্দি খেঁকরে উঠলো। 'তারপর ছেলে তিনটেকে টেনে নিয়ে রাগে গর্ গর্ করতে করতে ঘরে ঢুকে গেল।

২

আন্দির মেজছেলেটার বয়স হবে বছর ছয়েক। সবটা বুঝুক না বুঝুক—কৌতূহল তার সব দিকে। মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে রাত্তিরে সে জিজ্ঞেস করলে, 'ওরা সব কারা এসেছে আম্মা?'

বড় ছেলে ভুটে একটু বেশী সেয়ানা—বয়স তার বছর দশেক। সে বললে, 'ওরা সব মামা—সেই যে আগে এসেছিল আরো!'—

মেজাজ চড়ে আছে আন্দির নানান ঝঞ্ঝাটে। ভুটের ওপরে খেঁকরে উঠে বললে, 'ফের যদি মামা বলবি তো কেটে ফেলাব।'

আন্দি বলে কেউ ছিল কোনোদিন এই ভবঘুরে কাকমারার দলে—সে কথা ভুলতে চায় সে। চাষীর বউ সে এখন—ঘরগেরস্থালী নিয়ে ছেলেপুলের মা। কিসান-জননী।

ভুটে কিন্তু ফের জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা আম্মা—মোদের ঘরে কোনো কুটুম তো আসে না!'

'কুটুম এসে একেবারে রাজ্যি দেবে! নাই বা এলো—মোদের কি চলছে না!'

মায়ের মেজাজ দেখে ভুটে থামলো।

আন্দি একটু থেমে বললে, 'আছে—তোর কাকারা আছে, জ্যাঠারা আছে,

হোই উত্তর দেশে সে এক গাঁয়ে।' অর্থাৎ স্বামীর সম্পর্কিত চাষী গেরস্থরা সব। একটু দম নিয়ে আন্দি আবার বললে, 'কত জমি জায়গা, গোরু বাছুর তাদের সব—গোলায় ধান, পুকুরে মাছ।'

কাকমারা বেদিনীর মনে গজিয়েছে শেকড়—একদিকে আঁকড়ে ধরেছে পৃথিবীর মাটি আর একদিকে পল্লবিত হয়ে উঠেছে ঘরে গেরস্থালীতে পুষ্পিত মেহগ নি গাছের মতো।

ভুটে বললে, 'আমরা তবে যাই না কেন কাকাদের কাছে?'

'না—আমরাও যাই না, তারাও আসে না। আসবে কেন তারা? সে যে চলে এলো একদিন সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে।'

'কে আম্মা?'

'কে আবার—তোদের বাপ। তোরা তখনো জন্মাসনি।'

তখন সবে রঙ লেগেছে বাইশ বছরের জোয়ান চাষী জগার চোখে—ঘুর-ঘুর করে সারা দিনরাত গাঁয়ের হাটচালার ধারে কাকমারার ঝুপড়ি টঙগুলোর আশেপাশে। নবযৌবনের মোহ—আন্দিকে ঘিরে তখন তার অনাস্বাদিত আনন্দের স্বর্গ। তার জাতের শাসন আর গাঁয়ের বাঁধন—কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারলে না তাকে শেষ পর্যন্ত। কি ছিল শ্যামলা মেয়েটার চিকন মুখে চোখে—একদিন বাউরা হয়ে বেরিয়ে গেল সে ওই ভবঘুরের দলের সঙ্গে। ঘুরে বেড়ালো কতদিন গাছতলায় গাছতলায়—হাটচালায়-চালায়। দিনগুলো ভাসে আন্দি বেওয়ার চোখে। ভালবাসার জাতবর্ণ নেই। এই বেদিনী মেয়েটার চোখ ছল ছল করে অন্ধকারে সেই একটা লোকের জন্যে—যে নোঙর-ছেঁড়া জীবনে তাকে দিল স্বস্তির স্বাদ, শান্তির স্বাদ—রঙের মাতলামীই শুধু নয়।

চাষীর রক্তে আছে ঘরের টান—মাটির টান। একদিন তাই জগা বললে, 'আয় ঘর বাঁধি—চাষ-আবাদ করি।'

কিন্তু কাকমারার মেয়েকে বউ ক'রে কোন গাঁয়ে সে বাস করবে চাষীর মতো! তার সমাজ তাকে বেইজ্জৎ করবে পদে পদে। ঘুরে ঘুরে এসে পড়লো সে এই চরে। এ চর তখন সবে হাঁসিল হচ্ছে। সে হলো 'মুড়াকাটি' প্রজা—অর্থাৎ বনবাদা কেটে যারা আবাদ ক'রে প্রথমে এসে—ঘর বাঁধে।

বানভাসি বেদেনীর লাগলো নতুন নেশা—জমির নেশা, ঘরের নেশা। স্বামীর সঙ্গে মিলে যতোটা পারলে আবাদ করলে দু-হাতে। তারপর সে হলো জননী—জন্ম দিল এ চরের নতুন তিনটি প্রজার, বাদা হাঁসিল করা জমির উত্তরাধিকার। স্বামী তার বাঁধ বাঁধলো, ফসল ফলালো, ঘর গড়লো এ চরে।

ভুটে বললে, 'শুধু তুই আর বাবা গোটা চর আবাদ করলি?'

'না—আরও লোক ছিল। কিন্তু তোর বাপের মতো চাষী ছিল কে! কে ছিল অমন জোয়ান মরদ—শক্ত কাজের লোক!' বেদিনীর মুগ্ধ নারী সত্তা এই নগণ্য চাষীর কুঁড়ের অন্ধকারকে মুহূর্তে যেন মুখর ক'রে তোলে। এই অবোধ শিশুগুলো বাপের কথা শুধু শোনেই—বোঝে না মায়ের উত্তেজনা, তার সহসা চকিত ভাবান্তর।

ছেলেগুলো ঘুমিয়ে পড়লো একে একে। বাইরে কাকমারার দলও নীরব নিঃসাড় হয়ে গেছে। আন্দি জেগে রইলো উৎকর্ণ হয়ে। একটি লোকের প্রতীক্ষা করতে লাগলো সে। আর ছটফট্ করতে লাগলো মনে মনে।

মাগন মণ্ডল এলো অনেক রাত ক'রে। তার কাশির শব্দ শুনে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো আন্দি। দরোজা খুলে দিল।

মাগন বললে, 'হলো না কিছুই—শালা তশীলদার জরিপ-সাহেবকে একেবারে হাত করে ফেলেছে, মায় আমিন পর্যন্ত।'

আন্দি প্রায় দম বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলো, 'জরিপ সাহেব কি বললে?'

'বলবে আর কি—যা করবার তাই করলে।' মাগন বললো, 'জগার সব

জমি—মায় ভিটে পর্যন্ত খাস হয়ে গেল জমিদারের নামে। জগার কোনো ওয়ারিশ নাই—এই কথা মেনে নিল জরিপ সাহেব।'

'আর এই তিন-তিনটা ব্যাটা, আমি!' আন্দি দাঁতে দাঁত চেপে বললে।

'সব কথাই আমি বলেছি আন্দি।'

'বলেছ সব? বলেছ, কেমন ক'রে আবাদ করেছিলম এ চর, কেমন ক'রে গতর দিয়ে করেছিলম একে সোনার মাটি। বলেছ?—মোর মনে হয়, বুঝিয়ে বলতে পারোনি সব।'

'মোকে শুধু অবিশ্বাস করবি আন্দি চিরকাল?'

আন্দি বললে, 'আমি আর কারোকে বিশ্বাস করি না। এই তিন-তিনটা ব্যাটা, তার বাপের কেউ নয়—এই কথাটাই সত্যি বলে দাগা হয়ে যাবে সরকারী কাগজে?'

'আহা—বুঝলি না? এ শালা সেই গোবিন্দ তশীলদারের কারসাজি আর মালিকের ঘুষের জোর। আমি কি আর বলতে কিছু বাকি রেখেছি!'

'তবে?' আন্দি জ্বলে উঠে বললে, 'ভিটে ছাড়া করবে বলে তশীলদার হুমকি দেখায় মোকে,—কেড়ে লেবে মোর ব্যাটার হক পাওনার জমি!—বলেছ সব?'

'আহা—সে সব কি আর বলিনি!'

'কে জানে—বলেছ কি-না।' আন্দি গর্ গর্ ক'রে বললে, 'মোর ব্যাটাদের জমির ওপরে সব শালা ঢ্যামনার লোভ—মায় মালিক পর্যন্ত। বিশ্বাস করি কাকে!'

হঠাৎ এ কথায় মাগনের মুখটা শুকিয়ে আমশি হয়ে গেল একেবারে। অন্ধকারে দেখতে পেল না আন্দি—দেখতে পেলে হয়তো থমকে যেত। সে এক পুরানো কথা—হিয়ের কথা মাগনের। ঠিক ওই ভাষায় অমনি ক'রেই আন্দি জবাব দিয়েছিল আরও একদিন—জগার মরার পর মাগন যেদিন

একসঙ্গে ঘর বাঁধার প্রস্তাব করেছিল। একেবারে নিঃসঙ্গ টিংটিংয়ে এই লোকটার হিয়ের কথা যেন দাগই কাটেনি এই যুবতীর মনে। এক হাতের ঝাঁটা দেখিয়ে চরের চ্যাংড়া ইল্লুতে মরদগুলোকে যেমন দাঁড় করিয়ে রেখেছিল তফাতে—তেমনি হাঁকড়ে দিয়েছিল মাগনকেও।

আজও সেই মহাস্ত্রটার উল্লেখ ক'রে ফের বললে আন্দি, 'ঝাঁটা মারি ওই ঢ্যামনা গোবিন্দর মুখে।'

মাগন বললে, 'তা মারিস তাকে একশোবার। কিন্তু আমি তোর কি করলম আন্দি! তোর ব্যাটার জমির জন্যে, ভিটের জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাঠে-ঘাটে, আমিনের কাছে, জরিপ হাকিমের কাছে।'—

কথাটা মিথ্যে নয়। আন্দি চুপ ক'রে রইলো।

মাগন বললে—যেন কিছুটা অভিমানে, 'যা ভাবিস তোর ইচ্ছে। কাল হয়তো জরিপ হাকিম তোকে ডেকে শুনবে তোর কথা। আজ অনেক বলে কয়ে সেই বিচার চেয়ে এসেছি।'

মাগন চলে গেল। বাকী রাতটা কাটলো আন্দির ছটফটিয়ে—কাল কখন যাবে সে জরিপ-হাকিমের কাছে।

রাত থাকতে থাকতে দাওয়ায় বেরিয়ে এসে দেখলো—বাগাম্বরের দল তল্পিতল্পা বেঁধে বসেছে, এবার যাবে। ওদের দেখে খেঁকরে উঠে আন্দি বললে, 'ঝোলাঝুলি না দেখিয়ে যাচ্ছ যে বড় সব!'

হকচকিয়ে তাকালো সবাই। দেখতে দেখতে বিভ্রাট বেধে গেল একটা। এর ওর ঝোলাঝুলি থেকে কক্ কক্ ক'রে উড়ে বেরিয়ে এলো মুরগীর বাচ্চা, কার কাপড়ের তলা থেকে প্যাঁক প্যাঁক ক'রে উঠলো ধাড়ি হাঁস। গোবনা বিপদ বুঝে ঝোলা চেপে বসে পড়লো মাটিতে—মড় মড় করে ভেঙে গেল ডিমের কাঁড়ি, উঠোন ভেসে গেল ভাঙা ডিমের কুসুমে। রাত-কানা বেচারী অন্ধকারে হাঁস মুরগী ধরতে পারেনি—হাতড়ে কিছু ডিম

ভরেছিল ঝোলায়। কাঠ মেরে দাঁড়ালো বুড়ো বাগাম্বর। আন্দির হাতে ঘন ঘন ঝাঁটার আস্ফালন।

৩

মুখ বুজে অনেক গালাগালি হজম ক'রে, নাকে খত দিয়ে বাগাম্বরের দল যখন ছাড়া পেল তখন সূর্য উঠেছে আকাশে।

বাগাম্বর বললে, 'কাজটা খুব খারাপ করেছ সবাই। বেটির কাছে মোদের ইজ্জত রইলো না।'

দল নীরব। তাদের বলার কিছু নেই। নীরবে চলেছে মাথা নীচু ক'রে।

বাগাম্বর বললে ফের, 'তোমরা হয়তো ভেবেছিলে—বেটি মোদের বোকা হাবা মেয়া কিন্তু দেখলে তো।'—

সে যে কি দেখা—সকলেরই মুখে চোখে তা একেবারে দাগা।

শ্মশান পেরিয়ে একটা বাঁক নিতেই দলটা এসে পড়লো একেবারে মালিকের কাছারি বাড়ির কাছে। ওদের দেখে গোবিন্দ তশীলদার দাঁড়ালো সামনে এসে। সকৌতুকে বললে, 'ইদিকে কোথায় গেছলে সব হে—কুটুম বাড়ি?'

বাগাম্বর আভূমি সেলাম ক'রে বললে, 'হাঁ হুজুর—মোদের বেটির ঘর।'

'ভালো ভালো। তা এখানে সব ডেরা বেঁধে থাকবে তো—নাকি?'

বাগাম্বর এক গাল হেসে মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, 'বেটি কুটুমের ঘরের কাছে থাকলে মোদের কি আর ইজ্জৎ থাকবে হুজুর। বাগাম্বরের কাছে সেটি হবেনি কথনো। এই মোরা চলে যাচ্ছি।'

'বলো কি হে! আজই চলে যাবে বেটির গাঁ ছেড়ে?' গোবিন্দ বললে, 'থাক এসে মোদের কাছারির অতিথশালায়—ইজ্জৎ যাওয়ার কোনো ভয় নাই তোমার।' শেষে গোবিন্দ যেন 'হায় হায়' ক'রে বললে, 'কই কেউ

আস না তোমরা। তোমাদের পেয়েছি যখন—অন্তত একটা দিন থেকে যাও।'

লোকটা ঠাট্টা করছে কি না বুঝতে না পেরে বাগাম্বর তাকিয়ে রইলো বোকার মতো।

গোবিন্দ গোরু খেদানোর মতো ক'রে নিয়ে চললো সবাইকে। আফশোস করতে লাগলো বার বার—এমন সুন্দর কাক-মারারা এ চরে এসে ডেরা বাঁধে না বলে।

কাল থেকে দল প্রায় অভুক্ত। যন্ত্র-চালিতের মতো চললো গোবিন্দর পেছনে পেছনে।

ভোজের হৈ চৈ পড়ে গেল কাছারি-বাড়িতে। তিন-তিনটে চাকর ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে গোবিন্দ চক্কোত্তির ফরমাসে। পুকুরে পড়লো জাল, গাঁজা এলো ভরি ভরি, নিজে তদারক করতে লাগলো গোবিন্দ। কাকমারার দল দিব্যি বসে বসে খেতে লাগলো শুধু একদিন নয়—পুরো দুটো দিন। চরের চাষাভূসোরা অবাক হলো প্রথমে—তারপর কানাঘুষো করতে লাগলো এই বলে, 'ও আর কিছু লয়—দলে চেংড়ি যুবতী আছে কটা, তশীলদারের নজর পড়েছে সেই দিকে। শালা চরে এবার কাকমারা বসাবে গো।'

কিন্তু বাগাম্বর গাঁজায় দম দিয়ে দলের লোককে বোঝালে, 'এত খাতির তাদের—শুধু পয়মন্ত সেই বেটির জন্যে।'

দু-দিন তারিখ পেছিয়ে জরিপ-হাকিমের তাঁবুতে ডেপুটেশনের এজলাস বসলো তৃতীয় দিনে। এ দু-দিন কি ক'রে যে কেটেছে আন্দির—এ শুধু সেই জানে। ভিটে ছাড়ার হুমকী দিয়ে গেছে গোবিন্দ—যাচ্ছেতাই ক'রে বলে গেছে তার পেয়াদারা। মুখ শুকনো ক'রে নিরুপায়ের মতো ঘুরে ঘুরে গেছে মাগন মণ্ডল। চরের পুরানো প্রজারা দেখিয়ে গেছে কপাল।

পাথরের মতো মুখ ক'রে থেকেছে আন্দি। তিন দিনের দিন ছুটলো সে তাঁবুতে তিনটে ছেলেকে সঙ্গে ক'রে। তখন সন্ধ্যে।

মাগন বললে, 'এই হলো জগার বউ হুজুর।'

গোবিন্দ খেঁকরে উঠলো, 'বউ না আর কিছু! জগার রক্ষিতা হুজুর।'

হাকিম জিজ্ঞেস করলে, 'জগার সঙ্গে তোমার বিয়ে-সাদি হয়েছিল?'

গোবিন্দ মহা একটা রসিকতার কথা শুনে যেন খ্যাক খ্যাক ক'রে হেসে উঠলো। বললে, 'কাকমারা মাগীর সঙ্গে সচ্চাষীর বিয়ে-সাদি হুজুর!'

হাকিম শুধালো আন্দিকে, 'তোমার জাত কি?'

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে আন্দি—যেন এখনও কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছে না।

গোবিন্দ নিজের চাকরকে দিয়ে ডেকে পাঠালো বাগাম্বরকে। সব তৈরী ছিল গোবিন্দর। বাগাম্বর এসে দাঁড়ালো তার অদ্ভুত বেশবাস নিয়ে—মাথায় কাকের পালক গোঁজা, লাল শালুর পাগড়ী, গলায় লাল নীল কাঁচের মালা, হাতে লোহার বালা আর কানে কুণ্ডল।

গোবিন্দ বললে, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন হুজুর। ও ওদেরি জাত।'

হাকিম আন্দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ওকে তুমি চেন?'

বাগাম্বর আভূমি সেলাম ক'রে বললে, 'হাঁ হুজুর—মোদের বেটি, খুব পয়মন্ত বেটি।'—

বাকীটুকু বললে গোবিন্দ—কেমন ক'রে জগা ওই কাকমারার মেয়েকে নিয়ে চরে এসে ঘর বেঁধেছিল, সেই সব কথা। শেষে বললে, 'এরকম একছার হয় হুজুর। উদো চাষাভূসো যেমন ফাঁদে পড়ে তেমন ও মাগীরাও একটা থেকে আর একটার কাঁধে চাপে। সব বেশ্যার শামিল।'

আচ্ছন্ন মগজে এতক্ষণে যেন কথাগুলো ছুরির মতো কেটে কেটে বসছে

আন্দির। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠলো, 'কি বললি হারামের ব্যাটা—আমি বেশ্যা!'

'না তুই সতী নক্ষ্মী।' গোবিন্দ ডাকলে তার নিজের কাছারি বাড়ীর চাকর হারাধনকে। জিজ্ঞেস করলে, 'সত্যি কথা বল ব্যাটা বামুনের সামনে—হুজুরও রয়েছেন, কতদিন থেকে যাওয়া-আসা করছিস ওই মাগীটার কাছে?'

হারাধন মাথা নীচু ক'রে বললে, 'জগা মরার মাস দুই পর থেকে হুজুর।'

গোবিন্দ বললে হাকিমকে, 'এই সব ছোটলোকের জাত হুজুর। নোংরা কথা শুনে হয়তো আপনার কষ্ট হচ্ছে।'

মুখ টিপে হাসলো হাকিম সাহেব। তাকালো আন্দির দিকে। দেখতে-দেখতে ঘাবড়ে যাওয়া ফ্যাকাশে মুখে ফিরে এসেছে ওর যৌবনের বলিষ্ঠ উচ্ছ্বাস—ওর গভীর কালো চোখে ঝিকিয়ে উঠেছে সেই বেপরোয়া বেদিনী। কোলের ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে একটা বাঘিনীর মতো ছুটে গেল সে হারাধনের দিকে। এক লহমায় গিয়ে চেপে ধরলো তার গলা:

'হারামির বাচ্চা!'—

হৈ-চৈ করে উঠলো গোবিন্দ। হারাধন চেঁচাতে লাগলো প্রাণপণে। ছুটে এলো পেয়াদারা। ধরাধরি করে ছাড়িয়ে দিল হারাধনকে। বোকার মতো খাপছাড়া ভাবে হাকিমের দিয়ে চেয়ে আবার চিৎকার ক'রে উঠলো আন্দি নিজের তিনটে ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, 'ওরা মোর ব্যাটা—হোই গ্যাখ অবোধ বালকরা মোর। ওরা পাবে না তার বাপের হাঁসিল করা জমিন! বল—বল—আমি ওদের আম্মা! বল মোকে'—

গোবিন্দ ভেংচি কেটে বললে, 'রক্ষিতার বাচ্চা, সে আবার ওয়ারিশ! তোর জাতের দল বসে আছে হোই বাইরে—চলে যা তাদের সঙ্গে।'—

'তোকে মেরে ফেলাবো—মেরে ফেলাবো হারামি'—গর্জে উঠে ছুটে গেল আন্দি গোবিন্দের দিকে।

গোবিন্দ টপ্ করে লাফ দিয়ে হুজুরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখুন হুজুর—ছোট জাতের স্বভাব।'

'তোর ভদ্দরলোকের মুখে মারি লাথ!'—

এমন সময় বাইরে একটা কলরব পাকিয়ে ওঠে সহসা। বহুদূর থেকে চেঁচাচ্ছে যেন কে :

'আগুন আগুন'......

কে বললে, 'তোর ঘরে আগুন আন্দি!'—

কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো আন্দি। তার পর ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে ছুটলো সে তাঁবু ছেড়ে ঘরের দিকে। অন্য দুটো ছেলে কেঁদে উঠলো পেছনে ভয় পেয়ে। তারা ছুটলো মায়ের পেছনে পেছনে।

চাষার কুঁড়ে। পুড়ে শেষ হতে আর কতোক্ষণই বা লাগে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে আগুন ধরে জ্বলে শেষ হয়ে গেল। কেরোসিন তেল চুম্বকের মতো টেনে নিল আগুনকে। দড়ি ছিঁড়ে গোরুগুলো পালালো কোথায় বনে বাদাড়ে, দম বন্ধ হয়ে মরে গেল কটা ছাগল, পুড়ে মরে গেল প্রায় সব হাঁস মুরগীগুলো। সেই ছাই ভস্মের পাশে তিনটে ছেলেকে নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলো আন্দি।

ব্যাপারটার গভীরত্ব বুঝেই বোধ হয় বুড়ো বাগাম্বর গেল সান্ত্বনা দিতে, 'ও সব ঝুটমুটের জন্যে দুখ্ করিসনি বেটি! মোরা কাকমারার জাত! ওরা যখন তাড়াবেই তো চল মোদের সঙ্গে। দল বসে আছে তোর জন্যে। কেউ যাইনি মোরা—চল।'

...আবার সেই নোঙর-ছেঁড়া জীবন!—

কিন্তু আন্দির চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখে আর কথাটি মাত্র না বলে পালিয়েছে

বুড়ো বাগাম্বর। ওই ভঙ্গীর পরিচয় সে পেয়েছে এই ক'দিন আগে। আন্দি খাড়া দাঁড়িয়ে রইলো এক জায়গায়।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটা ঢিল এসে টাঁই করে লাগলো মেজছেলেটার কপালে। দেখতে দেখতে কচি তাজা রক্তের ধারায় ভেসে গেল তার মুখ। 'আম্মা গো' বলে বসে পড়লো ছেলেটা। তার রক্ত-ধারার দিকে চেয়ে চেয়ে ঝকমক ক'রে উঠলো আন্দির পাথর-কালো চোখ দুটো।

মাগন ছুটে এসে তুলে ধরলো ছেলেটাকে। আন্দির দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, 'এখনও বলছি—পালা এখন এখান থেকে আন্দি। মোর ঘরে চল। ভোর হোক।'

'যাবো!' দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে আন্দি বললে, 'কোথায় যাবো মোর ব্যাটাদের ভিটে ছেড়ে? ওদের মতো জম্ম দিইনি মোরা এ চরের!'—

মাগন কাকুতি করে বললে, 'এখনকার মতো শুধু সরে যা এখান থেকে—আবার কি অঘটন ঘটে যাবে একটা। হাই দ্যাখ শালা ছ্যাঁচড় হারাধন ঘোরাঘুরি করছে।'—

অদূরে একটা ঝুপি জঙ্গলের আড়ালে দেখা গেল ডোরাকাটা সার্ট হারাধনকে—যে সাক্ষী দিয়েছিল আন্দির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে বলে। তাকে দেখে চোখ জ্বলে উঠলো আন্দির।

'এসে তাড়াক মোকে গিধ্‌ধোড়ের বাচ্চারা।' বিড় বিড় করে বললে আবার আন্দি, 'মোর মরদের ভিটে, মোর ব্যাটার ভিটে!'—

'হ্যাঁ হ্যাঁ—এ তোর ব্যাটারই ভিটে।' মাগন ওর একটা হাত চেপে ধরে বললে, 'এ চরের চাষীরা তা সবাই জানে। তারা বলেছে—তোর ব্যাটার জমিই তারা চষে আবাদ করবে। এই পোড়া ভিটেয় আবার ঘর তুলে দেবে। কেউ তাড়াতে পারবে না তোর ব্যাটাদের। ও হাজার লেখা হোক

কাগজে কলমে। সবাই বসে আছে মোর দাওয়ায়—চল নিজে শুধোবি। এখন চল তুই এথেন থেকে—হাতে ধরে বলছি তোর—সরে চল।'—

অন্ধকার থেকে আবার একটা ঢিল এসে পড়লো এবার আন্দির গায়ে। চেঁচিয়ে উঠলো এবার ঘুমন্ত কচি ছেলেটা।

মাগন একটা হাত চেপে ধরলো আন্দির, 'চল আন্দি—সরে পালা।'—

'না।'—

হঠাৎ ফেটে পড়া একটা সবল কণ্ঠ নিস্তরঙ্গ মরা অন্ধকারকে যেন আলোড়িত কম্পিত ক'রে তোলে মুহূর্তে।

তিনটে ছেলেকে ঘিরে তেমনি অটল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো আন্দি—নড়লো না এক পা। নিভন্ত আগুনের রক্তিমাভাই যেন এই বাঘিন মেয়েটার সর্বাঙ্গে জ্বলছে—জ্বলছে তার প্রেমে, তার মাতৃত্বে, তার অবিচল অধিকারে। তার সামনে আর সব তুচ্ছ ঝাপ্সা অন্ধকার হয়ে গেছে চার পাশে।

বেটি

সেই ডোরা-কাটা হাফ সার্ট পরা ছোঁড়াটা এসেছে আবার। পান্তি তাকে পিঁড়ি পেতে দিয়েছে দাওয়ায়, খাতির যত্ন ক'রে আবার তামাকও সেজে দিয়েছে। দিয়ে নিজে পাশের একটা খুঁটিতে দাঁড়িয়েছে ঠেস দিয়ে। দেখে গা জ্বলে গেছে মথুরা দাসের—মুখের চেহারা ততোধিক পোড়া। মথুরাকে দেখেই পান্তি অবিশ্যি চলে গেল ঘরের মধ্যে—তবু চলে যাওয়ার সময় তার চোখের কোণের বাঁকা চাউনি আর ঠোঁটের চাপা হাসি চোখ এড়ালো না মথুরার। মেজাজ আরও বারুদ। তবু সব রাগ চেপে সহজ ভাবে কথা বলতে হলো তাকে ডোরা-কাটা সার্টের সঙ্গে :

'সব ভালো তো হারাধন।'

কিন্তু রাগে ফেটে পড়লো সে হারাধন চলে যাওয়ার পর। হাঁক পাড়লো, 'পান্তি!'—

'কি বাবা!' পান্তি সহজভাবে বেরিয়ে এলো ঘরের ভেতর থেকে—দাঁড়ালো এসে বাপের সামনে।

'ওই হারামজাদা ছুঁচোটা এসেছিল কতক্ষণ?'

পান্তি অবাক হয়ে তাকালো বাপের মুখের দিকে—ওর সম্বন্ধে এত মিঠে মিঠে বুলি এর আগে কোনদিন শোনেনি ব'লে। তবু পান্তি সহজ সরল·

ভাবেই বললো, 'তা অনেকক্ষণ এসেছে তো—বেলা ছিল তখন। বসেছিল তোমার জন্যে।'

'ব-সে-ছি-ল!' মথুরা খেঁকরে উঠলো, 'আবার খাতির ক'রে পিঁড়ি পেতে তামাক সেজে দেওয়া হয়েছে। গাঁয়ের সকলের কথা-টথা খুব শুধোলে না?'

'তা ভালো-মন্দ সব শুধালো তো!'

'আর আমি সব বললাম।' পান্তির গলার নকল ক'রে মথুরা ভেঙিয়ে উঠলো। হুংকার দিয়ে বললে, 'ও এলে ফের যদি তুই ঘরের বার হবি হারামজাদি! ধাড়ী মেয়া—লাজ সরম নাই তোর! ওর সঙ্গে অতো খাতির কিসের?'

হায় কপাল! পান্তি অবাক। অবাকই তো—কি বলে তার বাপ! বিয়ে-সাদির সব ঠিকঠাক, মায় পণের টাকা পর্যন্ত কিছুটা নেওয়া হয়ে গেছে হারাধনের কাছ থেকে—দশ গণ্ডা টাকা, বর্ষার সময়ে। সেই টাকা ভেঙে খেয়েছে, চাষ-আবাদ করেছে। এখন কার্তিক মাস—ফসল ওঠার দিনও আর বেশী বাকী নেই। কথা আছে—ফসল উঠলে বিয়ে-সাদি চুকবে। এত কথার পরে হঠাৎ বাপ তার আজ বলে কি আবার!

মথুরা দাঁতে চিবিয়ে বললে, 'ও এলে লাথ মারবি এবার—লাথ, বুঝলি?'

'মোকে বলা কেন।' পান্তি বললো গজ গজ ক'রে, 'একদিন টাকা খেয়েছে যে—লাথ মারতে হলে সেই মারুক।'

'মারবো তো—আমিই মারবো এবার এলে। বেদোর বাচ্চা আমার হবু জামাই সেজে এসেছে, না জমিদারের গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে।'

এমন সময় আর একটি আধ বুড়ো মানুষ নিঃশব্দে দাওয়ায় এসে বসলো। তাকে দেখে তিনগুণ মেজাজ চড়ে গেল মথুরার। বললো, 'শোন ভুতু খুড়া শোন, মোকে বলে ধান লুট করতে কে কে গেছলো, নাম বলে দাও। না হ'লে জমিদারের পাইক, পেয়াদা, পুলিস-গারদ নানা হাঙ্গামা হজ্জুৎ হবে। মোকে লোভ দেখায়—'

'কে !' ভুতু খুড়ো জিজ্ঞেস করলো ঠাণ্ডা গলায়।

'কে আর—মোর হবু জামাই, শালা জমিদারের নফর, হারাধন।'

আস্তে আস্তে নিজ-মূর্তি ধরছে এবার পান্তি। বললো, 'ধান লুট করেছই তো। লুটে আনলে তো সবাই।'

'বেশ করেছি। মোরা চাষ করেছিলাম আধ-পেটা খেয়ে—মোদের ধান, মোরা এনেছি। না আনলে না খেয়ে মরতিস যে হারামজাদী। এই বলে দিলম—এক কথা মোর, ফের যদি ও আসে—'

'টাকা খেয়েছ তখন—আসবেনি আজ!' কোমর বেঁধে পান্তি রুখে দাঁড়ালো।

মথুরা ভুতু খুড়োর দিকে চেয়ে বললো, 'দেখ, মোর মেয়ার ভঙ্গী দেখ খুড়া।' মথুরা হুংকার দিল, 'কেটে ফেলাব বলে দিলম—দু'খণ্ড ক'রে ভাসিয়ে দেব গাঙে।'

'গুণের বাপ মোর—তিন তিনবার বেচলে মোকে লোকের কাছে—কোথায় না কোথায়। চলে তো যেতম মোর কপাল নিয়ে—ডেকে ফুসলে আনলে কেন ফের। কাট না—কেটে ফেলাও মোকে—একেবারে শেষ করে দাও।'

মুখবাজ মেয়েটা রুখে দাঁড়িয়েছে মরিয়া হয়ে।

'বেচলম—হাঁ আমি বেচলম।' বোকা হাবার মত হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠলো শেষ পর্যন্ত মথুরা। ওর রোগা শুটকো বুড়ো মুখটার রেখাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো আবেগে—কোটরে ঢোকা দুটো চোখের জল হয়তো বেশী ছিল না, সামান্য দু'ফোঁটা দু'চোখের কোণে শুধু উপচে উঠলো। বলতে লাগলো সে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, 'বেচলম পেটের জ্বালায়—বেচলম তোর মাকে বাঁচাবো বলে, তোকে বাঁচাবো বলে। ওরে, তুই কি জানবি—'

মথুরাকে টেনে নিয়ে গেল ভুতু খুড়ো, 'কেঁদোনি—চলো, চলো মোর ঘরে। মোদের দুঃখের কথা ওরা কি জানে। চলো।'

মথুরা কাঁধের নোংরা গামছায় চোখ মুছতে মুছতে বললো, 'ওই জমিদারের নফর হারাধনের সঙ্গে মোর মেয়ার বিয়ে-সাদি আমি কিছুতেই দেব না খুড়া। তখন না বুঝে পণ নিয়ে ফেলেছি—কিন্তু ও না চাষী, না বুঝে চাষ-আবাদ। না তার দুঃখ কষ্ট। ও নফর—চাকর।'

'ন্যায্য কথা।'

'মোকে বলে কি-না—'

'চুপ কর মথুর। মাথা গরম কোরোনি। এখন ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার সময়।'

মথুরা চুপ করলো। নীরবে হেঁটে চলেছে দু'জন ভেড়ি-বাঁধের ওপর দিয়ে—দু'পাশে গর্ভিনী ধানবনের হিল্লোল। ভুতু কি যেন ভাবছে—ওর কুঁচকানো কপালে চিন্তার কালো ছায়া।

এক সময়ে মথুরা আফশোস ক'রে ব'লে উঠলো, 'মেয়াটার মোর স্বভাব খারাপ হয়ে গেল—ভারি মুখবাজ।'

'কত জায়গায়—কোথায় না কোথায় রেখে এসেছিলে মথুরা। পাঁচ জায়গায় ঘুরে ভয় ডর আর নাই। কথায় বলে—নারী নষ্ট হাটে।'

মথুরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'মোর কপালের দোষ।'

কপালের দোষ বৈ কি। ওর ঘটি নেই, বাটি নেই—গরু নেই, জমি নেই। আছে ওই এক মেয়ে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালে দুর্ভিক্ষ হলো দেশ জোড়া। মথুরের বউ ধুঁকে ধুঁকে বাঁচতে বাঁচতে অসুখে পড়লো। কি অসুখ কে জানে, পেটের জ্বালায় আর চেঁচালও না, ঝগড়াও করলো না। শুধু ঝিম মেরে যেতে লাগলো। শেষকালে মথুর একদিন বছর চারেকের মেয়েটাকে কাঁধে করে হাঁটা দিল আধা শহুরে জায়গা এগরা বাজার।

'মেয়েটাকে লেবে বাবু—পাঁচ দশ টাকা যা হয় দাও। ও বাঁচবে তোমাদের এঁটোকাটা যাই হোক খেয়ে—মোর বউটাও বাঁচবে বাবু—হেই বাবু, একদম সচ্চাষীর মেয়া—জাত—অজাত নয়—'

ঘুরতে ঘুরতে কোন ডাক্তারের কাছে পছিয়ে দিয়ে এসেছিল পান্তিকে মাত্র পাঁচ টাকায়। দুর্ভিক্ষের বছর দু-তিন পরে একবার ফসল হলো ভালো। সঙ্গে সঙ্গে মন উসখুস ক'রে উঠলো মথুরার—মেয়েটার জন্যে। মণ খানেক ধান বেচে ট্যাঁকে টাকা গুঁজে চললো মথুরা মেয়েকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। কিন্তু ডাক্তারের বাড়ীর সামনে গিয়ে হঠাৎ ভয় ধরে গেল তার—চাইলে যদি না দেয় মেয়েটাকে! আর পড়বি তো পড়, মেযেটাও পড়ে গেল সেই সময় সামনে। বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন মুচড়ে উঠেছিল তার। আর কোনো ভাবনা চিন্তা নয়—মেয়েটাকে সোজা কোল-পাঁজা ক'রে দে ছুট। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল মেয়েটা—তার মুখে হাত চাপা দিয়ে সড়ক রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে বনবাদাড় ভেঙে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট। ক্রোশ খানেক একভাবে ছুটে এসে মেয়েটাকে একটা ঝুপসি বনের আড়ালে নামিয়ে দম নিয়েছিল। মেয়েটা কেঁদে উঠেছিল ভয় পেয়ে। মথুরা আদর করে বলেছিল, 'ভয় পাসনি মা—আমি তোর বাপ। তোর নিজের বাপ আমি—বেচে দিয়েছিলম পেটের জ্বালায়।'

মথুরের বেচার মতো ওই একটি জিনিসই আছে—এবং একবার বেচে বারবারের সাহসও বেড়ে গেছে। এমনি ক'রে দু'পাঁচ বছর কাটে—বেচে আবার সুদিনের মুখ দেখলে চুরি ক'রে নিয়েও পালিয়ে আসে।

কিন্তু ডাগর মেয়ে এবার রুখে দাঁড়াতে শিখেছে। বুঝতে শিখেছে—বাপ তাকে বেচে বেচে দেয়। আড়ে-চাড়ে ভরেনি বটে—তবু বয়স তো হলো ওর সতেরো। শেষের দিকে কোন এক সাহু বাড়ীতে এঁটো পাত খেয়ে খেয়ে ধিকিয়ে ধিকিয়ে বেড়েছে বেওয়ারিশ মেয়ের মতো। দেহে যৌবন

এসেছে—নিতান্ত না এলে নয় বলে। এই ডাগর মেয়ে—ডাগর হয়েছে পরের লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে, বাঁচার তাগিদে ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে ক'রে। সে মেয়েকে সহজে স্বমতে বাগ মানাবে কি ক'রে মথুরা দাস !

পারবে না। এ মেয়ের নিজের পছন্দ অপছন্দ আছে।

দু'চার দিন যেতে না যেতেই মথুরা বুঝলো কথাটা ভালো করে। কারণ, আবার সেই ডোরাকাটা হাফসার্ট এলো। পান্তি গেঁছলো জল আনতে—তার সঙ্গে দেখা ঘাটের কাছে বটগাছের তলায়। মাঠের ধারের পুকুর—লোকালয় থেকে দূরে, নির্জন। চারপাশ জুড়ে শুধু সবুজ ধানবনের তরঙ্গ।

ডোরাকাটা সার্টের সাহস বেড়ে গেছে। সে সোজা আজ পান্তির হাত চেপে ধরলো। তার পণ দিয়ে বায়না করা বউ।

কিন্তু পান্তির ভয়—বাপের যা মতিগতি, বিয়ে যদি না দেয় ! ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল পান্তি। বললে, 'বাপকে মোর ভয় হয়, নিঠুর বাপ মোর।' মেয়েটার চোখে জল এসে গেছে সতেরো বছরের নির্বোধ গেঁয়ো আবেগে।

হারাধন জবরদস্তি আদর ক'রে বললে, 'ভয় কি—মোরা তো পালাব এ গাঁ ছেড়ে। এ গাঁয়ে হাঙ্গাম হুজ্জুত হবে—পুলিস আসবে আর দু'দিন বাদে দেখ না। একথা বলিসনি কারোকে।'

'বাপকেও ধরবে মোর তবে !'

'আসল দোষী ধরা না পড়লে নির্দোষী তো ধরা পড়বেই। ধানের গোলা লুঠ—যে-সে কথা !'

'সবাই তো দোষী—পেটের জ্বালায় সবাই তো খেয়েছে। সবাইকে ধরুক তা হলে।'

'আসলে এ মতলব দিচ্ছে কে কে। জমিদার তাদেরই চায়।'

তাদের চেনে না পান্তি। শুধু একটা ফোঁপানি ঠেলে আসে বুকের ভেতর থেকে।

কেমন একটা দুর্দিন ঘনঘোর হ'য়ে আসছে চারদিক থেকে।

ভয়ে কেঁদে ফেলে পান্তি।

হারাধন ফের জবরদস্তি আদর ক'রে আশ্বাস দিল, 'মোদের ভয় কি। বরং জমিদার বলেছে, বিয়ে-সাদি চুকে গেলে ঘর ক'রে দেবে মোদের—বাস্তুর ভিটে দেবে একটুন।'

অনেকক্ষণ কেটে গেল পান্তির জল আনতে গিয়ে। মথুরা তখন দাওয়ায় বসে আছে গুম্ মেরে। পান্তি ফিরে এলো প্রায় সন্ধ্যে লাগিয়ে। মথুরা তাকালো তার দিকে একবার কটমট ক'রে। আফশোস করতে লাগলো মনে মনে—মেয়ে তার বড় হয়ে গেছে, গায়ে হাত দেবে কি করে! নইলে আজ হয়তো রাগের মাথায় বসিয়েই দিত ঘা কতক। ডাগর হয়ে গেছে মেয়ে—এখন গরীব বাপ আর ওর কেউ নয়। কথায় বলে—মেয়ে হলো পরের জন্যে, পরের ঘরই তার আপন। সেই আপন ঘর বেছে নিয়েছে পান্তি: হতচ্ছাড়া সেই ডোরাকাটা হাফ সার্ট।

'মরুক।'—মনে মনে গাল পাড়লো মথুরা। দাওয়ায় অন্ধকারে বসে রইলো ভূতের মতো।

পান্তি সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখ বাজাতে যেতেই রাগে ফেটে পড়বার সুযোগ পেলে মথুরা। হুংকার দিয়ে বললো, 'খবর্দার বলছি—শাঁখ বাজাবিনি।'

পান্তি অবাক্ চোখে তাকালো বাপের দিকে। বলে কি! চাষীর গাঁ! কার্তিক মাস। মাঠের ধানবনে লক্ষ্মীর আসন পাতা হচ্ছে—দু'দিন বাদে ফসল আসবে ঘরে। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে ভাগ্য-লক্ষ্মীর নাম স্মরণ করে গাঁয়ের মেয়ে-বউ, লক্ষ্মীর পাঁচালী শোনে এ সময়ে। আর তার লক্ষ্মীছাড়া বাপের হুকুম কি!

'মরুক আমার কি!'—পান্তি রাগ ক'রে শাঁখ তুলে রাখলো।

মথুরা ফের হুংকার দিলে, 'শাঁখ আর কোন দিন বাজাবিনি বলে দিলম।'

পান্তি মনে মনে গজ্ গজ্ ক'রে বললো, 'শুধু এই লক্ষ্মীছাড়া ঘরটা বাদ দিয়ে রাজ্যের ঘরে লক্ষ্মী আসুক। সন্ধ্যের পিদিম জ্বালুক তারা—শাঁখ বাজিয়ে বরণ করুক ঘরের লক্ষ্মীকে।'

কিন্তু কোথায় কার ঘরে শঙ্খধ্বনি! একটি সন্ধ্যের শাঁখও তো শোনা যায় না কারুর ঘরে! পান্তি অবাক। হ'লো কি সব!

তার বাপের মুখ গম্ভীর—চিন্তাকুটিল, কথা আজকাল প্রায় বলেই না সেই ঝগড়ার পর থেকে। কোনো কিছু শুধাতেও ভরসা হয় না। কিছু বুঝতে পারে না পান্তি। শুধু তার মনে হয়—এই নীরব সন্ধ্যের অন্ধকারের আড়ালে ক্ষুধার্ত গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে কিছু যেন একটা ঘটে যাচ্ছে। অন্য দিন এমন সময়ে শঙ্খরোল প'ড়ে যেত। কিন্তু আজ থম্ থম্ ক'রছে সবটা—ঝড়ের আগে আকাশের মতো। মনে পড়লো—ডোরা-কাটা সার্ট গায়ে লোকটি আজ বলে গেছে, পুলিস আসবে দু'দিন বাদে। কে জানে, হবে হয়তো এ সেই ধান লুটের ব্যাপার। লুট করেছে—এখন বুঝুক ঠ্যালা।

পান্তি রাগ ক'রে সন্ধ্যের পিদিমটাকে দিলে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে। লক্ষ্মী-ছাড়া ঘরে টিম টিম ক'রে শুধু ওটা জ্বলে হবে কি!

মথুরা তাকিয়ে ছিল কটমট ক'রে—হুংকার দিয়ে উঠলো, 'ওটা নেভালি যে! লক্ষ্মীছাড়ি বেসরম!'—

পান্তি দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে সামনে দিয়ে চলে গেল বেপরোয়া ভাবে।

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে মথুরার: কি কুক্ষণে সে এই মেয়েটাকে ফিরিয়ে এনেছিল এবার—সুখে থাকবে বলে! হায় রে হায়!—

অনেক কটা বছর সে মনে পাষাণ দিয়ে পড়েছিল সাহুজীর কাছে তৃতীয় বার বেচে আসার পর। মেয়েটা ডাগর হয়ে উঠেছে দেখে সাহুজী একটু বেশী টাকাই দিয়েছিল তাকে আর সাদা কাগজে টিপ-সই করিয়ে তবে ছেড়ে ছিল।

ভড়কে গিয়ে মথুরা আর ওপাশ ঘেঁষেনি। মনে প্রবোধ দিয়েছিল—যাক, তার মেয়ে নেই—মরেই গেছে ধরো।

কিন্তু তার নিজেরই মরা মন বেঁচে উঠলো যে! বাঁধ-ভাঙা কোন বেঁচে ওঠার বন্যা এলো গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মরা চাষীর ঘরে ঘরে—এক জোট হয়ে দখল নিল ধানের ক্ষেতে আর খামারে। এত জমি—এত ধান! হায় রে হায়—এমন দিনে শূন্য ঘরের দিকে চেয়ে বুকের ভেতরে নড়ে উঠলো মেয়ের কথা। এত দিনে কত বড় হয়েছে মেয়েটা কে জানে!

ঘরে আর টিকতে পারলো না মথুরা—চললো সেই সাহুজীর গদিতে। আশেপাশেই ঘুরলো কদিন—কোথায় যে সাহুজীর জেনানা মহল—কে জানে। মেয়েটার পাত্তাই পাওয়া যায় না। ক'দিন ঘোরাঘুরির পর মথুরা মেয়ের দেখা পেল—পেছনের পুকুরঘাটে দুপুর বেলা এসেছিল এঁটো বাসন মাজতে।

মথুরা ঝোপের আড়াল থেকে ডাকলো হাত নেড়ে—মেয়েটা ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইলো তো রইলই। তারপর বোধ হয় চিনতে পেরে কাছিয়ে এসেছিল ভয়ে ভয়ে। কাছে এসে ছলছলিয়ে উঠেছিল ওর চোখ। কিন্তু তার কাঁদবার আগেই মথুরা ফুঁপিয়ে উঠেছিল, 'ক্ষ্যামা দে মা—ক্ষ্যামা দে তোর গরীব বাপকে। আর নয়—অতি বড় দিব্যি গেলে বলছি আর নয়, ঘরে ঘুরে চল।'—

মেয়েটা বলেছিল, 'সাহুজী কিছুদিন আগে বেচে দিয়েছে মোকে আর একটা খারাপ লোকের কাছে। সে নাকি বেশ্যার কারবার করে। ক'দিন বাদে নিয়ে চলে যাবে মোকে।'—

'তবে!' মুখ শুকিয়ে গেছলো মথুরার—বুকের ভেতরটা তোলপাড় ক'রে উঠেছিল আবার। 'তবে এখুনি পালিয়ে চল মা। কেউ কোথাও নেই। ছুটতে পারবিনি—এঁ্যা! ওরে তুই না গেলে আমার ঘর যে হা-হা করবে।'

'তারপর আবার দুদিন বাদে তো তুমি বেচে দেবে মোকে!'

'ওরে আর না—আর না। তুই শুধু বেচাটাই দেখলি বেটি—ছুটে ছুটে আসি কেন বুঝলি না রে! আর বেচবো না। বেচবো কেন? দেখবি চল গাঁয়ে, বেচার দুঃখ ঘুচে গেছে তোর বাপের।'

কিন্তু কি ধাড়ি কালসাপ ঘুরিয়ে এনেছিল সে—হায় রে বাপ্!

অন্ধকার দাওয়ায় বসে বসে আজ আপশোষ করে মথুরা।

শাঁখ বাজলো সেদিন অনেক রাতে। শুধু একটি শাঁখ।

মথুরার তন্দ্রার মতো এসেছিল, শুয়ে পড়েছিল দাওয়ায়—উঠে পড়লো ধড়মড় ক'রে। বেরিয়ে গেল দাওয়া থেকে—অন্ধকারে মিশে গেল চুপচাপ।

কোথায় গেল যেন। বাপের কাণ্ড উঁকি মেরে দেখলো পান্তি। কৌতূহলে বেরিয়ে এলো বাইরে। শাঁখের শব্দটা থেমে গেছে। পান্তি চেয়ে দেখলো আকাশভরা তারার আলোয়—তার বাপ হন্ হন্ ক'রে চলে যাচ্ছে কোথায় যেন। আরও একটি মূর্তি—পেছনে আরও একটি। আরও। নিঃসাড়। কেউ কাউকে ডাকছে না।

কোথায় যাচ্ছে ওরা? পান্তির মেয়েলী কৌতূহল ঠেলে উঠলো। এক পা এক পা ক'রে সে পেছু নিল ওদের। এসে ঠেকলো লখিন্দর মণ্ডলের ঝুপড়ি টঙের কাছে। পাশের একটা ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে লাগলো —নিঃসাড়ে একে একে আরও এলো অনেকে। চেনা যায় না অন্ধকারে। এক সময়ে ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল কুঁড়ের বাঁশের দরোজাটা।

ছিটে বেড়ার ঘর। পান্তি কান পাতলো গিয়ে দেওয়ালে। শোনা যায় মজলিশের চাপা চাপা কথা।

কে বললো, 'হারাধন এসেছিল নাকি?'

'তোমার বেটি বলেছে কারো নাম?' ভুতুর বুড়ো গলায় শঙ্কিত জিজ্ঞাসা।

তারপরেই হাউমাউ করে ওঠে মথুরা, 'তার কথা শুধিয়োনি মোকে।

সে মোর ব্যাটা নয়—বেটি, পরের ঘরে যাওয়ার জন্যে তার মন। ব্যাটা হলে বুঝতো—বাপের দুঃখ, গেরামের মাটির টান, বাপের ঘরের ব্যথা।'—

কে বললো, 'কথায় বলে বেটি পর-ঘরী।'

এমন সময় খপ ক'রে কে চেপে ধরলো পান্তিকে পেছন থেকে। ঝটকা মেরে সে ছুটে পালাতে চাইলো—পারলো না। ধস্তাধস্তি ক'রে তাকে ধরে নিয়ে গেল সেই কুঁড়ের ভেতরে।

পান্তি আড়ি পেতে শুনতে আসবে এত রাতে—এতটা কেউ আশা করেনি। সবাই কাঠ।

মথুরা লজ্জায় অপমানে কাঁপছে থর থর ক'রে। বসে থাকতে পারলো না—উঠে দাঁড়ালো উত্তেজনায়। ছুটে গিয়ে চুলের মুঠি চেপে ধরলো পান্তির।

'কালামুখী!'—

সবাই ধরে ফেললো মথুরাকে।

মথুরা পান্তিকে ছেড়ে দিয়ে কেঁদে উঠলো আবার হাউমাউ ক'রে, 'ও কালামুখীর জন্যে মোকে দণ্ড দাও তোমরা—কি ওকে মেরে ফেলতে চাও, মেরে ফ্যাল। মোর দয়া মায়া নাই আর ওর জন্যে। ও মোর কলঙ্ক—মোদের গেরামের কলঙ্ক।'—বলে সে আর দাঁড়াতে পারলো না—মজলিশ থেকে লজ্জায় অপমানে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে গ্রামেরই চেনা মানুষ সবাই—বুড়োরা আর জোয়ান ছোকরারা। কিন্তু কারুরি মুখের দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না। মুখে দু'হাত ঢেকে শুধু ফোঁপাতে লাগলো।

একটি ছোকরা মতো চাষী জেরা করতে লাগলো, 'এখানে কে আসতে বলেছে তোমাকে—এ্যাঁ? হারাধন?'

'না—না—না।' পান্তি সমানে ফোঁপাতে লাগলো।

'মিছা কথা বোলোনি। হারাধন আজ এসেছিল—মোরা জানি।'

পান্তি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'সে বলে গেল—পুলিস আসবে দু'দিন বাদে।'—

কঠোর ক্ষুধার্ত মুখগুলি অন্ধকারে তাকালো পরস্পরের দিকে।

সেই ছোকরা চাষীটি আবার কথা বললো, 'তবে বুঝে দেখ—মোদের গুলী করবে, কি গারদ দেবে, কি করবে তার ঠিক নাই। কে মরবো, কে বাঁচবো জানি না। কার নাম বলবে তুমি মথুর দাসের ঝি? সবাই মোরা পেটের জ্বালায় জ্বলে বাঁচতে চেয়েছিলাম। তোমার বাপ দেখছিল এবার গোলা-ভরা ধানের স্বপন। ভরসা ক'রে তাই তোমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল সাহু খোট্টার বাড়ী থেকে—এবার সুখে থাকবে বেটিকে নিয়ে।'

পান্তি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'তোমরা পালাও এ গেরাম ছেড়ে।'

'কোথায় যাব বলতে পার!' কৌতুক ক'রে যেন বললো সে, 'কোন গেরামে গেলে মোদের পেটের জ্বালা মিটবে! কোন গেরামে গেলে বোন-বেটিকে বাঁচাতে পারবো—তোমার বাপের মতো আর বেচতে ছুটবো না! আর, আর কোথায়ই বা যাবো এ গেরাম—সাত পুরুষের এ জন্মের ভিটা ফেলে বলো তো?'

পান্তি বললো খোঁচা খাওয়া কথার যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে, 'মোকে ছেড়ে দাও।'

'যাও—তোমাকে কেউ ধরে রাখবেনি। তুমি এ গেরামের বেটি, তোমার সঙ্গে মোদের বিরোধ নাই কোনো। চল—অন্ধকার রাত, সঙ্গে যাই।' এগিয়ে দেওয়ার জন্য উঠলো সেই ছোকরা চাষীটি।

তার আগেই পান্তি তেমনি হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বেরিরে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার সময় বলে গেল শুধু, 'তোমরা পালাও।'—

ছুটে সে বেরিয়ে এলো বটে ঘর থেকে কিন্তু কিছুটা এসে থমকে দাঁড়ালো রাস্তার মাঝখানে। কেমন ভয় করতে লাগলো তার।

কিছুক্ষণ পরে সেই ছোকরা চাষীটি তাকে অনুসরণ ক'রে এসে দাঁড়ালো সামনে। হেসে বললে, 'ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে মথুর দাসের ঝি?'

পান্তি কেঁদে ফেলে বললে, 'নিষ্ঠুর বাপ মোর মেরে ফেলবে ঘরে গেলে।'

'মারবে কেন! সে মোরা বলে দেব।' সে হেসে বললে, 'মেয়ে মানুষের গায়ে মোরা হাত তুলি না। চলো।'—

মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারে সেই ছোকরা চাষীর মুখে কি দেখলো কি জানি পান্তি, বোকার মতো চেয়ে রইলো তো রইলোই।

দু'দিন পরের কথা। ভোর রাত্রে পান্তির ঘুম ভাঙলো একটানা এক শঙ্খরোলে। শঙ্খধ্বনির এ ঠারঠোর সে বোঝে না। তাকে কেউ বলেওনি। গ্রামের অন্য মেয়েরা জানলেও তাকে সবাই এড়িয়ে গেছে। সে যেন এ গাঁয়ের শত্রু। তাই শাঁখের শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে, মনে হলো তার—বোধ হয় ভূমিকম্প হচ্ছে। দাওয়ায় বেরিয়ে এলো বাপের খোঁজে। কিন্তু কোথায় তার বাপ! দাওয়ার এক কোণে পাতা বিছানাটা খালি। হঠাৎ কেমন একটা অজানা ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো তার।

গ্রামময় তখন শঙ্খরোল। সে-ও শাঁখ তুলে নিল হাতে। ফুঁ দিলে। তারপর আস্তে আস্তে চারিদিক থেকে থিতিয়ে এলো শাঁখের শব্দ। গ্রাম প্রান্তর পরিব্যাপ্ত ফিকে অন্ধকারে শব্দহীন এক শূন্যতায় কিছুক্ষণ আগের উচ্চকিত গ্রামটা যেন আবার আস্তে আস্তে মরে গেল। পান্তি অসহায়ের মতো চেয়ে রইলো দুর্জ্ঞেয় অন্ধকারের দিকে। কেমন ভয় করে হঠাৎ তার। বাপ নেই ঘরে। কোথায় চলে গেল তাকে ফেলে!

কিছুক্ষণ বাদে বন্দুকধারী পুলিস বাহিনী আর জমিদারের পাইক লাঠিয়ালে ঘিরে ফেললো সারা গ্রামটা। বুনো শুয়োর তাড়া করার মতো গ্রামের বন-বাদাড় ভেঙে, কিসান পাড়ার কুঁড়েগুলো ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে হতাশ হয়ে গেল

শেষ পর্যন্ত—একটাও মরদ নেই। আছে শুধু মেয়েলোক আর কাচ্চাবাচ্চা। ধমকাধমকি করলে জবাব সকলের এক :

'টানের দিন—মরদরা সব মাটির কাজ করতে চলে গেছে।'

'টানের দিন!' দারোগা সাহেব দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, 'আর লুটের ধান? বার কর মাগী।'—

'হায় গো বাবু, পেটে দানা নাই—ধান কুথা!'—

'মাটির নীচে পুঁতেছে কোথায় শালারা—খোঁড় মেঝে।'

কিছু নেই—কোথাও কিছু নেই! মায় মাটি খোঁড়ার কোদালটি পর্যন্ত। হতাশায় আক্রোশ আরও ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। লণ্ডভণ্ড হতে থাকে কুঁড়েগুলো—কে কোথায় আর্তনাদ করে যেন। বড় কচি গলা।

দাওয়ার খুঁটি ধরে কাঠ হয়ে শুনছে পান্তি।

এমন সময় হারাধন এলো। তার পেছনে পেছনে ফৌজ লাঠিয়াল। দারোগা জিজ্ঞেস করলো :

'তুমি বাছা মথুর দাসের মেয়ে?'

গলা যেন গলে পড়ছে মোমের মতো। কিন্তু পান্তি দাঁড়িয়ে আছে একভাবে।

কাছ ঘেঁষে হারাধন দাঁড়িয়েছিল পান্তির—খোঁচা দিয়ে বললো, 'বল না।'

পান্তি নিরুত্তর।

হারাধনই বললো অগত্যা, 'হাঁ হুজুর।'

দারোগা আবার জিজ্ঞেস করলো নরম গলায়, 'গাঁয়ের সব পুরুষরা কোথায় লুকিয়েছে বলো তো বাছা।'

তবু চুপ ক'রে আছে পান্তি। হারাধন অধৈর্য হয়ে চাপা গলায় বললো চোখের ইসারা ক'রে, 'বলে দে না চটপট।'

পান্তি তবু কথা বলে না।

দারোগা ঠোঁট কামড়ালো একবার। তারপর আবার বললো মোলায়েম করে, 'ভয় নেই তোমার মেয়ে। বলো। আচ্ছা সকলের কথা না হয় থাক, ধান লুট করবার জন্যে উসকে ছিল কে কে বলো তো!'

'বলে দে না নাম কটা।' হারাধন ফিস ফিস ক'রে বললো অসহিষ্ণু হয়ে, 'দিয়ে চল মোরা চলে যাই। শুনচিস?—পান্তি!'—বলে সে পান্তির একটা হাত ধরে একটু চাপ দিলে।

বাপ বলেছিল তার—'সে মোর ব্যাটা নয়—বেটি'—কথাটা ঝিকিয়ে ওঠে এই সময়ে পান্তির মনে। ঝিকিয়ে ওঠে মুহূর্তে আরও বহুদিনের কথা।··· কে একটা লোক সেই এক ডাক্তারের বাড়ী থেকে তাকে ছোঁ-মেরে বুকে তুলে নিয়ে ছুট দিল গ্রামের দিকে। ভয়ে সে কেঁদে উঠেছিল প্রায়। লোকটা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ছুটতে লাগলো তো লাগলই। একটা ফাঁকা জনশূন্য জায়গায় কোল থেকে তাকে নামিয়ে বলেছিল :

'আমি তোর বাপ। বড় দুর্দিনে তোকে বেচেছিলম মা। ঘুরৎ চাইলে পাছে না দেয়—তাই—'

সেই বাপ আবার তাকে সাহুজীর বাড়ী থেকে চুরি ক'রে আনবার সময় কেঁদে উঠে বলেছিল না?—বলেছিল, 'শুধু বেচাটাই দেখলি মা—ছুটে ছুটে আসি কেন বুঝলি না রে! ··· দেখবি চল গাঁয়ে, বেচার দুঃখ ঘুচে গেছে তোর বাপের।'

আর সেই ছোকরা চাষীটি—কি বলেছিল তাকে যেন সেদিন রাতের বেলা—কি বলেছিল যেন বুঝিয়ে বুঝিয়ে অনেক কথা?—গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কেমন সব। ঠোঁট কাঁপছে পান্তির।

'বলো মা বলো।' দারোগা জিজ্ঞেস করলো আবার।

হারাধন বললো হাতে আবার একটা চাপ দিয়ে, 'বলে দে না।'

'ছেড়ে দাও—হাত ছেড়ে দাও বলছি মোর।' এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল পান্তি, 'খবর্দার—গায়ে হাত দেবে না বলছি মোর!'—

দারোগা ঠোঁট কামড়ালো আবার। পাশে দাঁড়িয়েছিল জমিদারের টেকো গোমস্তা একজন। তাকে চোখ ঠেরে চাপা গলায় বললো, 'এখানে হবে না। নিয়ে চলো। একটু বাঁকাতে হবে।'

গোমস্তার চোখের ইসারায় ক'জন পাইক চেপে ধরলো গিয়ে পান্তিকে— হেঁচকা টান মেরে বললো, 'চল হারামজাদী—হারাধনের সঙ্গে তোর সাদি হবে।'

গাঁয়ের সবাই ভাবলো—হয়তো বিয়ে-সাদি হয়েই গেল পান্তির। দু'দিন —তিন দিন কেটে গেল, কোনো লক্ষণ নেই ফিরে আসার। হয়তো নাম বলে দিয়েছে সে সকলের—মায় তার বাপের নামটি পর্যন্ত। এবারে হুলিয়া আসবে একেবারে।

কিন্তু হুলিয়া এলো না কারোর নামে—এলো পান্তি। কে একটা ভূতের মতো নিশাচর লোক অন্ধকারে লালগঞ্জের ভেড়ি-বাঁধের উপর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো তিন দিন পরে গ্রাম সীমান্তের খালের সাঁকোর কাছে। গোরু ভাগাড়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ক'রে বাঁশে হাত-পা বেঁধে সাঁকোর ধারে ফেলে গেছে পান্তিকে। সে কারুর নাম বলেছিল কি-না কে জানে, তবে জিভটা তার মুখের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে এক পাশ দিয়ে, বাঁ চোখটা ফুলে উঠেছে না চোখের ডিমটা বেরিয়ে পড়েছে ঠেলে তা অন্ধকারে বোঝার উপায় নেই, ফুলে ফেঁপে গোদা হয়ে গেছে পা দুটো —হয়তো ঝুলিয়ে রেখেছিল কোথাও। বাঁশ থেকে তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে ভূতের মতো সেই লোকটা দাঁড় করাতে গেছলো পান্তিকে—দুম ক'রে সে পড়ে গেল উল্টে। তবু প্রাণ ছিল—কারণ ককিয়ে উঠেছিল যেন। ঝিমানো ডান চোখটায় সমস্ত শক্তি দিয়ে পরম আগ্রহে চেয়ে দেখেছিল—লোকটা কি তার বাপ, না সেই ছোকরা চাষীটি—যে একদিন রাতে তাকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল!—চিনতে পারলো না।

ভাই

নদী থেকে একটা খাল মাথা ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়েছে চরের মধ্যে। কিছুটা এঁকে বেঁকে গিয়ে ফের মোড় নিয়েছে নদীর দিকে। এই খালের মুখে এসে নোঙর করে বড় বড় মহাজনী নৌকো। চরের ধান তুলে নিয়ে যায়। কখনো চোরাবাজারে—কখনো সরকারী সংগ্রহ বিভাগ। চরের চাষীরাই ধান বয়ে তুলে দেয় নৌকোয়—বস্তা পিছু দু-পয়সা। বস্তায় এক মণ থাকার কথা—কিন্তু চোরা গোপ্তায় চলে যায় দেড় মণ করে। খালের উঁচু পাড় থেকে কিছুটা দূরে চরের মালিকের কাছারি বাড়ী—গোলা খামার। সেইখানে থাকে নায়েব গোমস্তা তহশীলদার। ধান বয়ে আনতে হয় সেইখান থেকে। উঁচু পাড় বেয়ে বেয়ে নামতে হয়—উঠতে হয়। ভাটা হয়ে গেলে হয়রানের এক শেষ। জল নেমে যায় অনেক নিচে—নৌকা বসে যায় প্রায় পলিমাটিতে। প্রায় পনেরো হাত উঁচু পাড় বেয়ে দেড়মুণি বস্তা মাথায় নিয়ে নামতে হয় নৌকোর কাছে সন্তর্পণে—পা টিপে টিপে।

বুড়ো ভজহরি সাঁতরা কোন রকমে নড়বড়ে কোমরটাকে সিধে ক'রে দম চেপে চেপে ধান বইছে অন্যান্য চাষীর সঙ্গে। হাঁপিয়ে পড়ছে কয়েক বস্তার পরই। তামাক খাচ্ছে ঘন ঘন—শক্ত করছে স্নায়ু। সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন। ধান বওয়া বন্ধ হয়নি তবু। সন্ধ্যের ঠাণ্ডা অন্ধকারকে মুখর ক'রে তুলেছে ধান মাপের ডাক :

'রামে রাম—দুবে দুই—দুবে তিন—তিনে তিন—'

'কত রাত তক্ ধান মাপা চলবে গো!' ভজহরি একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলো আগের লোককে।

'চোবা বাজাবের ধান গো মামু—থাম এখন।' জবাব দিল আগেব লোক দম চেপে চেপে। মাথায ভারী বস্তা। বললো, 'পাঁচ-শো মণি নৌকা। রাতারাতি আজ বোঝাই শেষ হবে। তবে ছুটি।'—

'বও—বয়ে মরো শালারা।' কে একজন বললো পাশ থেকে, 'ফসল ফলালে—বইবেনি? এখন বয়ে মরো গোলা খালাস ক'রে জোতদারের।'

'তারপর হাওয়া লাগাও পেটে আশ্বিন কাত্তিক মাস ভর—তখন ক্ষুদ-কুঁড়োও থাকবেনি ঘরে।' ভজহবি হাঁফ নিয়ে বললে।

'সামলে মামু।'—

'হাঁ-হাঁ-হাঁ—ধরো ধরো—হেই'—

হঠাৎ একটা হাল্লা ওঠে। ধান মাপাব ডাক তখনও চলছে এক ঘেয়ে বিষণ্ণ স্বরে :

'উনিশা—নিশ, নিশা—বিশ, বিশা বিশ'—

কিন্তু হাল্লা চেঁচামেচি পাকিয়ে উঠতে থাকে নির্জন খাল পাড়ের ওপরে। অর্থবহ কালো কালো মূর্তিগুলো ছুটে আসে খাল পাড়ের দিকে ধানের বস্তা ফেলে।

'কে পড়লো? এঁ্যা?'

'মামু—ভজহরি সাঁতরা।'

'মরে গেল। ঘাড় মুচড়ে।'—

'যাঃ।'—

খালের উঁচু পাড় থেকে গড়াতে গড়াতে পড়লো ভজহরি আর তার মাথার

ধানের বস্তা। তারপর এক জায়গায় গিয়ে থামলো ভজহরি, আর তার থানের বস্তাটা গিয়ে চেপে বসলো বুক মুখ ঢেকে।

হঠাৎ কথা ফুরিয়ে গেছে যেন এতগুলো লোকের এই অপঘাতের সামনে দাঁড়িয়ে। সব কটি চাষী দাঁড়িয়েছে ঘিরে। কে বললো হঠাৎ নিঃশব্দতা ভেঙে :

'বড্ড আঁধার!'—

আর কেউ কোনো কথা বলে না। হঠাৎ সেই একটি লোকের কথা ঠাণ্ডা অন্ধকারে একটা আচমকা তরঙ্গ তুলে থেমে যায়—মিলিয়ে যায়। হ্যাঁ, বড্ড অন্ধকারই। ওরা দাঁড়িয়ে থাকে ভূতের মতো। পলিমাটির কাদা লেগেছে সারা গায়ে, ধানের ধুলো জমেছে সারা মাথা আর মুখ ভরে। পরণে মাত্র ছেঁড়া গামছা একখানা করে। আর ওদের ঘিরে, সারা মাঠ প্রান্তর জুড়ে, আকাশ দিগন্ত ভরে বড্ড অন্ধকার। সাড়া শব্দ নেই একটু কোথাও। ধান মাপের নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণ সুর থেমে গেছে কাছারি বাড়ীতে। সেদিক থেকে গদাইলস্করী চালে লোকজন আসছে আলো নিয়ে।

জীবন আর ভুবন চুপ করে চেয়ে আছে মরা বাপের দিকে। ধান বইতে এসেছিল তারাও।

চাষীদের ভেতর থেকে কে একজন বললো, 'থুরথুরে বুড়া লোকটা এলো ধান বইতে—শুধু পইসার লোভে'—

জীবন আর ভুবন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালো লোকটার মুখের দিকে অন্ধকারে। 'পইসার লোভে'—এই কথাটা ঘোরে তাদের ফাঁকা মনে। আর কোনো ছাপ পড়ে না কোথাও। সবটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে—হু হু করছে ফসল তোলা গ্রামের দিগন্ত ছোঁয়া মাঠের মতো। হাঁটুতে মুখ গুজে বসে থাকে দুজন। ভাবে একটা কথাই : রোজগারের একটা লোক কমে গেল তাদের সংসারে। হাঁ—'পইসার লোভে'—তারপর—

তারপর অনেক অনেক্ষণ পরে ফোঁপাতে লাগলো দুজনেই। তাদের

বাপ মরে গেল—বহু দুঃখে কষ্টে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে বহু দিনের খেটে মরা একটা বুড়ো মানুষ।

শ্মশানে পুড়িয়ে শেষ ক'রে ঘরমুখো পথে ফিরতে ফিরতে হিসেব করে দু-ভাই : সংসারের রোজগেরে লোক একটা মরে গেল যতো হোক।

বড় ভাই জীবনই খোঁজ রাখে সংসারের ভুবনের চেয়ে বেশী। ক্ষতির দিনে জীবন আস্তে আস্তে হিসেব দেয় দায় আর দায়িত্বের, 'পাঁচ কাঠা জমি বাঁধা আছে দু-কুড়ি পাঁচ টাকায়।'—

'কোন জমি ?' ভুবন জিজ্ঞেস করলো অন্যমনস্কের মতো।

জীবন বললো, 'জমি আবার কটা আছে আমাদের ?'

ভুবন চুপ। ওই পাঁচ কাঠাই ছিল তাদের সব—তার গোটা ফসলটা উঠতো ঘরে। আর সব ভাগ-চাষ—আধা পাওনা। ভুবন জিজ্ঞেস করলো ফের :

'কতকে বাঁধা আছে বললে ?'

'দু-কুড়ি পাঁচ টাকা।' জীবন বললো আরও, 'মালিকের কাছে ধার আছে ফের সাত কুড়ি টাকা।'

'সাত কুড়ি !' ভুবন আঁৎকে বললো, 'অতো ধার ?'

'বাঃ, গত সনে বলদ কেনা হলো যে একটা !'

'আর জমিটাও বাঁধা দিলে ?'

'সে তো গেল সোনার মায়ের অসুখের সময়।'

'সে তোমার বোয়ের অসুখ—তুমি জান।' ভুবন রাগ ক'রে বললো, 'আমি কিছু জানি না।'

'জেনে রাখ—শুনে রাখ তবে। তখন যে বলবে, দাদা ঠকিয়েছে—চুরি করেছে, সে ভালো নয়।' জীবন হিসেব দিয়ে চললো, 'তারপর আবার মালিক ধানও পাবে পনেরো মণ।'

'কত।' ভুবনের মেজাজ চড়ছে এবার।

জীবন কিন্তু তেমনি আস্তে আস্তে হিসেব দিয়ে গেল, 'পনেরো মণ।'

'কেন?'

'সংসারে লোক কতগুলান খেতে! বছরের ধানে কুলায় না।'

'সে তো তোমারি এণ্ডিগেণ্ডি যতো—তার ওপর আবার এক শালীকে এনে পুষছো।—জানি না তোমার অতো হিসাব, অতো ধার। মোকে ভাগ ক'রে দাও—অত শোধ করতে পারবনি আমি।'

'তবে কি আমি একা শোধ করবো সব? এই তো মরা বাপকে শ্মশানে আনতেই খরচা হয়ে গেল প্রায় বিশ টাকা—ধার করলম'—

'আবার বিশটাকা ধার!' ভুবন জ্বলে উঠলো দপ ক'রে। হিসেবে অথৈ জল। ভুবন ফেটে পড়লো :

'তুমি ধার করেছ তুমি জানো। সোজা কথা—মোকে ভাগ ক'রে দাও। তোমার সঙ্গে আমি আর নাই।'

'বেশ। আগের ধার যা সব আছে?'

'আমি জানি না।'

'ওরে সোনার চাঁদ রে মোর!' জীবন খেঁকরে উঠলো এবার, 'বাপ বাপ ক'রে শোধ করতে হবে ধার—তারপর ভাগ হও।'

'তুমি বোয়ের নামে, শালীর নামে ধারকর্জ ফেঁদে রেখেছ—তার আমি কি জানি।'

মেজাজ চড়তে থাকে দু-জনেরি ধাপে ধাপে। হিসেব করতে করতে পড়ে গেছে অগাধসমুদ্রে। হাবুডুবু খেতে খেতে যেন হাত পা ছোঁড়ে পরস্পরের দিকে। জীবন খেঁকরে ওঠে, ভুবন খোঁচা মারে বার বার জীবনের বউ আর শালী নিয়ে।

'শালী পুষছে সোহাগ করে! ওদিকে বউ বিয়োচ্ছে বছর বছর। আমি একা মানুষ—মোর ধারধোর কিসের! ধার শোধ করো তুমি।'

'শুধু আমি !'

'তবে ?'—

'তোর বাপকে শোধ করতে হবে ধার।' দাঁতে চিবিয়ে বললো জীবন।

এবার সুরু হয় গালাগালি।

'কোন শালার ধার ধারি আমি।'

'সালিশ পঞ্চায়েৎ ডেকে ঘাড়ে ধরে আদায় হবে।'

'ঢের শালা আদায় করেছে।' ভুবন রুখে উঠে বললো, 'আমিও বলবো পঞ্চায়েতের কাছে তোমার কাণ্ড কারখানা। হিসেব ফেঁদেছে শালা সব বানিয়ে বানিয়ে।'

'তবে রে শালা।'

দুদ্দাড় মারামারি লেগে যায় শেষ পর্যন্ত চরম নিঃস্বতায়, কদর্যতায়। জীবনকে চিৎ করে ফেলে ছোট ভাই ভুবন চেপে বসে তার ছাতির ওপরে— গলা চেপে ধরে দু-হাতে পরম আক্রোশে। হাউ মাউ করে চিৎকার ক'রে ওঠে জীবনের ছেলে মেয়ে বউ। জীবনের শালী এসে টানাটানি করে ভুবনকে :

'ভুবনদা—অ ভুবনদা !'—

পাড়া পড়শী ছুটে এসে ছাড়িয়ে দেয় দু-জনাকে কোনো রকমে।

ফুঁসতে থাকে দু-ভাই চরম আক্রোশে পরম শত্রুর মতো।

শেষ পর্যন্ত মিটমাট করতে এলো গ্রামের পাঁচজন—বোঝাতে এলো :

'ধারকর্জ হলো তোমাদের আসল কথা।'

কিন্তু সেই মূল কথাটা মিটবে কিসে? মিটবে না, তাই ফুঁসতে থাকে দু-জন দু-জনের ওপরে।

জীবন বললো, 'আমি ও শালার আর মুখ দেখবোনি।'

ভুবন বললো, 'তোমরা এসেছ ভালো হয়েছে। মোকে ভাগ করে দিয়ে যাও।'

—'ভাগের তত্রে আছে ঢের।' গ্রামের বুড়ো মানুষ একজন বললো, 'ফাটা সানকী আর ফুটা ঘটি কটা। আর বলদ মাত্র দুটো। চাষ আবাদ তো এক সঙ্গে করতে হবে!'

জীবন বললো, 'ওর সঙ্গে চাষ আর বাস! ঘর তুমরা আধা আধি ভাগ ক'রে দিয়ে যাও। বলদ দিয়ে যাও একটা—ওর সঙ্গে চাষ আবাদ করবনি আমি। বরং বলদ বিক্রি ক'রে চাষে মজুর খাটবো।'

ভাগাভাগি হয়ে গেল দু-ভাই। পঞ্চায়েৎ বসে ঠিক ক'রে দিয়ে গেল—দুটো বলদ দু-জনেরই থাক তবে চাষ আবাদের সময় হবে এক সঙ্গে।—এক লাঙলে।

কিন্তু ঠিক চাষে নামার আগে জীবন বেচে দিয়ে বসলো তার ভাগের বলদ।

পড়শীরা অবাক হয়ে বললো, 'বেচে দিলে!'

জীবন মুখ গোমড়া ক'রে বললো, 'কি করবো—কতগুলান পেটের জোগাড় করতে হয় মোকে! আগে তো খেয়ে বাঁচি—তারপর চাষ আবাদ। ভুবনের আর কি—সে তো একলা মানুষ!'—

আর ভুবন বললো, 'হিংসায় মরে যাচ্ছে লোকটা। পাছে মোর ভালো হয়, তাই বেচে দিল। এখন এই ঘোর চাষের সময় কোথায় পাই আমি বলদ আর কোথায় পাই টাকা।—বলো! মোকে জব্দ করলো প্যাঁচ দিয়ে। বেশ—আমিও শোধ তুলবো।'

কয়েকদিন মন গুমরে ভাবলো ভুবন। তারপর আর কোনো পথ না পেয়ে থানায় গিয়ে পেট-জমার ডায়েরী লিখিয়ে এলো একটা: জীবন সাঁতরার কুমারী শালীর পেটে ছেলে আছে, পুলিস যেন নজর রাখে।

খবর পেয়ে জীবন তেড়ে গেল ভুবনের দিকে, 'তবে রে শালা—এই কাণ্ড তোর!'

ভুবন রুখে দাঁড়ালো, 'নিজের ঘরে কি কাণ্ড করছে তার ঠিক নাই—তেড়ে আসছে মোকে!'

'তোর ঘরে ও ফুরুৎ ফুরুৎ যায়—দেখেছি আমি।'

'পুলিস এলে তখন ওর কাছ থেকেই সব খবর বেরোবে।'

পুলিসের নাম শুনে ভড়কে যায় জীবন। মরিয়া হয়ে ক্ষেপে ওঠে। ছুটে যায় সে শালীর দিকে। চুলের ঝুটি ধরে হেঁচকা দিতে দিতে বললে, 'কি কাণ্ড বাধিয়েছিস বল হারামজাদী! মেরে ফেলাবো আজ তোকে।'

বছর পনেরো ষোল বয়সের মেয়েটা জীবনের পায়ে উপুড় হয়ে কাঁদে হাউ মাউ করে:

'কিছু জানিনি আমি—কিছু জানিনি!'—

'বড় পীরিত তোর ওর সঙ্গে—এ্যাঁ!' চুলের মুঠি ধরে তার মাথাটা ঠুকতে ঠুকতে বলে জীবন, 'কালসাপ পুষেছিলাম আমি। ফুরুৎ ফুরুৎ ক'রে শুধু যাওয়া ওর ঘরে! এখন?'

জীবনের বউ এসে টানাটানি ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল বোনকে। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না ভয়ে। সত্যি তো কোথা দিয়ে কি যেন ঘটে গেল। সবটায় কেমন তাক লেগে গেছে তার।

জীবন দাঁত খিঁচিয়ে বললো, 'ছাড়িয়ে নিয়ে গেলি তো বোনকে—এখন পুলিস এসে আমাকে যখন টানাটানি করবে তখন ছাড়াবে কে?' বলে সে রাগে, ভয়ে, নিরুপায়ে কেঁদে ফেললে হাউ মাউ ক'রে। তারপর গাল পাড়ে ভুবনের উদ্দেশে:

'শালার সঙ্গে বিয়ে দেবো বলে এনে রেখে ছিলম মেয়েটাকে। আজ মোর এই সব্বনাশটা করলো উল্টে!'—

মেয়েটা কাঁদে তার দিদির পায়ে মাথা গুঁজে গুঁজে, 'সব মিছা কথা দিদি—মিছা কথা। কিচ্ছু জানিনি আমি। মিছা কথা।'—

কিন্তু মিছে কথা হলেও তো পথ নেই! পুলিস আসবে—তারপর খোঁজ করবে অন্তঃসত্ত্বা কুমারীর! তখন না পেলেও দোষ, পেলে তো কথাই নেই। বলদ বেচার টাকাটা যেমন করে হোক বেরিয়ে যাবে পুলিসের মুখ চাপা দিতে। আর ভুবনকে যদি গিয়ে টানাটানি করে মিথ্যে ডায়েরী দিয়েছে বলে—তখন সে হয়তো বলে বসবে, 'আমি শুনেছিলাম হুজুর।' ডায়েরীও দিয়ে এসেছে সেই ভাবে। বড়জোর পুলিস তাকে দেবে ঘা কতক। কিন্তু জীবনের বলদ বেচার টাকাটা বেরিয়ে যাবে যেমন ক'রে হোক।

নিরুপায় আক্রোশে জীবন চুল ছেঁড়ে নিজের মাথার। অভিসম্পাত দেয় ভুবনের উদ্দেশে।

দু' ভায়ের বিবাদ গিয়ে ঠেকে চূড়ান্ত অবস্থায়।

গাঁয়ের বুড়ো মানুষরা মাথা নেড়ে নেড়ে পুরানো প্রবাদ আওড়ায়:

'ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই। হেঁ হেঁ—ঐতো হবেই বটে।'

'হাঁ—হবেই বটে। ই শালার দুনিয়ার নিয়ম। দেখে লাও, শেখো।'—

ভুবন চাষ শেষ করলো কোন রকমে একটা বলদ দিয়ে ঠেলেঠুলে—ধার-গাঁতা বদল দিয়ে। জীবন চাষ শেষ করলো জন-মজুর খেটে খেটে। তারই মধ্যে বদলা খেটে ভাগেও চাষ করলো সে দু' এক বিঘে। দু' ভায়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। একজন চলে উত্তর দিকে তো আর একজন চলে দক্ষিণে।

এমনি ক'রে নতুন ফসল ওঠার দিন এলো আবার।—

একটা বছরের এলোমেলো ঝাপটায় আর বিরোধে দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে যেন জীবনের। বুড়িয়ে গেছে। ঝুলে পড়েছে নিচের চোয়ালটা, দুটো কল ক্ষয়ে সাদা হয়ে গেছে, গর্তে ঢোকা চোখ দুটো শুকনো নিষ্প্রভ। মোটা মোটা হাড়ের কর্মঠ কাঠামোটাকে কে যেন জোর করে ভরে দিয়েছে মানুষের চামড়ার একটা থলের মধ্যে। নেই পেশী, নেই মাংস। আর রাত

ছাঁয়ে চোখের সামনে সব ধোঁয়া—তবু আগে একটু দেখতে পেত মিনমিনে।

সময়টা যাত্রাগানের। এখানে ওখানে লেগেই আছে। ধান কাটার আগের মরশুম। শীত তখনও পড়েনি। খাল পাড়ের ওপর দিয়ে চরের চাষীরা যায় যাত্রা শুনতে। জীবন অন্ধকারে বসে বসে শোনে তাদের কলকলানি—হাঁক ডাক। যাত্রাগান শোনার তারও ভারি সখ ছিল। যেখানে যত দূরেই হোক, যাত্রা হচ্ছে শুনলে ছুটতো দু-ভাই একসঙ্গে।

ভুবন ছোটে এখনও। হাঁক ডাক ক'রেই যায়। যেন শোনায় জীবনকে—সে যাত্রা শুনতে যাচ্ছে। খালের ওপার দিয়ে যায় চরের চাষীরা—এপার থেকে ভুবন হাঁক পাড়ে :

'দাঁড়াও হে—আমিও যাব।'

হাঁক পেড়ে চলে যায় ভুবন। জীবন গুম মেরে বসে থাকে দাওয়ায়। হঠাৎ মনে পড়ে যায় অতীতের কথা—ছেঁড়া টুকরো হারানো দিন। ভুবন ডাকতো :

'চলো দাদা।'

'বাপরে, এই রাতে খাল খানা পেরিয়ে! রাতকানা লোক আমি—যেতে পারবো না। এই সামনেই তো এক খাল।'

'পিঠে ক'রে পার করে দেবো—চলো না'—

'যাঃ, লোক হাসবে। বলবে—ছাখো একবার সখ জীবনের।'

'চলো তো তুমি।'

জীবন বেরিয়েছে ভাইয়ের হাত ধরে সলজ্জে—পার হয়েছে খাল খানা ভুবনের পিঠে চড়ে। তবু যাত্রা শুনতে গেছে! সে বেশী দিনের কথা নয়—এই তো বছর খানেক আগেও মাত্র। হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই কথা। আর আজ গা রী-রী করে।

এমনি এক যাত্রাগানের আসরে জীবনের শালী একদিন বললো, 'যাবে জামাই-বাবু—এই পাশের গেরামে হচ্ছে যাত্রা! হাত ধরে ধরে নিয়ে যাব আমি!'

আর যাবে কোথায়! মনে জ্বালা ধরেছিল, উঠছিল ধোঁয়া—আগুন হয়ে জ্বলে উঠলো দপ ক'রে।

'এঁ্যা—বড্ড সখ তোর, বড্ড সখ হারামজাদী! নাকি ঐ ভুবনার সঙ্গে বেলেল্লাপনা করতে! এঁ্যা!'

জীবনের শালী ভয়ে ছুটে পালালো তার দিদির কাছে।

জীবন গালি পাড়তে লাগলো সমানে। আর শপথ খেল গায়ের জ্বালায় জ্বলে:

'আর যদি কখনো যাত্রা শুনতে যাই—মরা বাপের নামে দিব্যি গেলে বলছি, আর যদি কখনো যাই।'—

ভিনগ্রামে যাত্রা শুনতে গিয়ে খবর নিয়ে এলো ভুবন কার কাছ থেকে; কোন চরের কোন চাষীরা নাকি এক জোট হয়ে লড়াইয়ে নেমে গেছে কোন জমিদারের সঙ্গে—ফসল আটক করবে, জমি ভাগ ক'রে নেবে নিজেদের মধ্যে।

কথাটা রটে যায় চরের চাষীদের মধ্যে। জীবনেরও কানে এসে ওঠে। যেহেতু ভুবনের মুখের কথা সেহেতু জীবন বললো:

'মিছে কথা!'

'আরে মোরাও তো শুনলাম।'

'ও ভুবনা বলেছে যখন—বাজে কথা। বিশ্বাস নাই মোর। বাস্!'

বিশ্বাস নেই জীবনের।

তবু দিনের পর দিন ধরে চরের দিগন্ত ছোঁয়া পাকা ফসলের মাঠ পেরিয়ে উড়ে উড়ে আসে অসংখ্য অভিনব অদ্ভুত কথাগুলি। হাটগঞ্জে গিয়ে হাঁ-করে শোনে চাষীরা চর-বাদা লালগঞ্জ গ্রাম-গ্রামান্তরের খবর—সেইগুলো ছড়িয়ে

পড়ে আগুনের টুকরোর মতো এখানে ওখানে। ক্ষুধার্ত, নিঃস্ব গ্রামের পর গ্রামে, চরের হুমড়ি খাওয়া কুঁড়েগুলোয় মন জ্বলে। চাষীরা দল পাকায়—আলোচনা করে। খবর ছড়ায়:

'হাঁ—ফসল আটক করেছে লালগঞ্জ।'

'কাছারি বাড়ীর নায়েব গোমস্তা পালালো নামখানা থেকে।'

'পুড়িয়ে দিল কাছারি বাড়ী।'

'পুলিস পালালো ভয়ে নন্দিগ্রাম থেকে।'

ভুবন পাগলার মতো খবরের সুলুক-সন্ধান করে। ঘোরে সব কোথায় কোথায়।

জীবন মাথা নেড়ে নেড়ে মুখ খারাপ ক'রে বলে, 'ও শালার কথা বিশ্বাস করিনি।'

এর মধ্যে একদিন এসে পড়লো একটা পাঁচ ইঞ্চি লাল কাগজের হ্যাণ্ডবিল। কোথা থেকে জোগাড় ক'রে এনেছে ভুবন। চরের চাষীরা লম্ফ জ্বালিয়ে ঘিরে বসলো তাকে।

'কি লেখা আছে ওতে—এঁ্যা?'

'সব চাষীরা ফসল আটক কর—জমি কেড়ে লাও। বলো মোরা খেতে পাবনি কেন?'

'ঠিক।'

'ঠিক কথা।'

'পড় ভুবন—পড়ে শোনা।'

সামান্য লেখাপড়া জানে ভুবন। তাইতে সে পড়লো বানান করে করে। চাষীরা উৎকর্ণ হয়ে শুনলো কৃষক সভার ডাক। কেউ কেউ কাগজখানা নিয়ে লম্ফর আলোয় দেখলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর গুম হয়ে বসলো সবাই। ঝড়ের আগে থম্ থমে আকাশের মতো।

সবাই এসেছে—শুধু জীবন নেই তাদের মধ্যে। পরের দিন একটি চাষী গিয়ে বললো তাকে :

'কাল গেলেনি যে তুমি।'

'ও শালা ভুব্‌নার কাণ্ড—মোকে জব্দ করার ফন্দি।' জীবন জবাব দিল সিধে।

'মোরা চরের এতগুলান চাষী গেলাম যে!'

'যাও তুমরা।'

তারপর ভুবন এলো বলতে। বহুদিন পরে কথা কইলো ভুবন। জীবন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুনলো।

'তুমি যাবে দাদা—চরের সব চাষীই যাবে। বিচার পরামর্শ করবে। সন্ধ্যের পর শাঁথ বাজবে যথন'—

সেদিন সন্ধ্যের পর থালের ওপার থেকে ডাক এলো শাঁথের। থালের উঁচু পাড়ে শব্দ হলো অনেকগুলি চলমান পায়ের। জীবন অন্ধকারে শুনলো কান থাড়া করে করে।

জীবনের বউ বলতে এলো, 'যাবে নাকি—এ্যা?'

জীবন চটে উঠলো, 'সে তোর বাপের দরকার কি! কানা মানুষ আমি—যাবো কেমন ক'রে? বলি থাল পেরোবো কেমন ক'রে? এ শালা ভুবনার কাণ্ড—মোকে মেরে ফেলার যতো ফন্দি।'—

জীবনের বউ দাঁড়িয়ে রইল ভয়ে।

জীবন বললো, 'ও শালা ভুবনা যেথানে আছে—আমি সেথানে নাই।'

জীবন নাই ও-সবের মধ্যে।

কিন্তু আর সবাই ভীড় ক'রে যায় কোথায় রাতের অন্ধকারে। সারা চরটা থম্ থম্ ক'রে কিসের সম্ভাবনায়! নায়েব গোমস্তা তাকায় কেমন সন্দিগ্ধ চোথে—হুম্‌কি দেয় গায়ে পড়ে। ধান কাটা সুরু হয়ে গেছে মাঠে। তারা

অকারণে ঘুরে ঘুরে যায় তার আশপাশ দিয়ে। শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে চাষী মেয়ে-মরদ—ধান কাটে দাঁতে দাঁত চেপে। মাঠের ধান কাটা শেষ হলো একদিন। তারপর ফসল তোলার পর রুখে দাঁড়ালো চরের চাষীরা। সার সার ফসলের বোঝা উঠতে লাগলো সিধে চাষীর ঘরে। ছুটে এলো মালিকের পাইক গোমস্তা।

এতদিনের ধোঁয়ানো আগুন জ্বলে উঠলো দপ্ করে।

সবটা কেমন এলোমেলো ছেঁড়া ছেঁড়া লাগে জীবনের কাছে। ভুবনের সঙ্গে সঙ্গে এ কি করলো গাঁয়ের চাষীরা! সবটা কেমন অসম্ভব মনে হয়। ভয়ে ভয়ে সে তাকায় কাছারী বাড়ীটার দিকে। কোনো সাড়া শব্দ নেই সেখানে। লোকজন সব আছে তবু মালিকের। কি করবে তারা কি জানি। ঘাবড়ে যায় জীবন. দেবে হয়তো আগুন লাগিয়ে ঘরে, অথবা উৎখাত ক'রে দেবে চর থেকে। না—নেই সে এ সবের মধ্যে। ভুবনার অসম্ভব ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার মধ্যে সে নেই।

অনেক রাত পর্যন্ত ধান কাটলো সে—বোঝা বাঁধলো। পাশাপাশি মাঠের লোক উঠে গেল একে একে। সকলের যাওয়ার অপেক্ষাই করছিল সে। তারপর কেউ কোথাও যখন নেই তখন তার শালী আর বউ ধরাধরি করে মস্ত একটা বোঝা তুলে দিল তার মাথায়।

জীবন বললো, 'হাতটা এবার ধর্ দেখি বউ। নে—চল্। শুধু খালটা পেরোতে পারলে বাস!'—

তারপর সিধে রাস্তা কাছারি বাড়ীর দিকে।

খালের পাড়ে উঠলো। এবার নামতে হবে।

'এখানে নামি বউ?'

'আস্তে—আস্তে।'

'নামবো?'

'নামো—আস্তে।'

নিটোল ফসলের বোঝায় কোমর কাঁপছে, ঘাড় কাঁপছে জীবনের। আস্তে আস্তে বউয়ের হাত ধরে ধরে এগোচ্ছে সে পায়ে পায়ে। তারপর খাল পেরিয়ে ওপারের পাড়ে উঠলো। এবার রাস্তা সিধে।

জীবন বললো, 'এবার হাত না ধরলেও গট গট ক'রে চলে যেতে পারি।'

'না না—হাত ধরে চলো।'

এবার রাস্তা মুখস্ত জীবনের। বাত-কানা চোখে ভাসছে সবটা। জীবন বললো, 'বাঁয়ে বাবলা গাছ।'

বউ বললে, 'হুঁ।'

'এবার তারক দাসের জমি।'

'দেখতে পাচ্ছ—এঁ্যা?'

'হ্যাঁ রে—সবটা যে মোর কানা চোখের ভেতরে।' জীবন হাসলো। বললো, 'বোঝাটা মালিকের জমায় দিতে পারলে—বাস। শালা ভুব্‌নার যতো সব কাণ্ড!'

কিন্তু কিছুটা গিয়েই জীবন বোঝা সমেত ধরা পড়ে গেল ভুবনের সামনাসামনি। ভুবন অবাক হয়ে বললে:

'দাদা—তুমি!'

জীবন তার কথায় কান না দিয়ে বউকে ঠেলা দিলে বললে, 'চল্।'

ভুবন বললো, 'সবাই ফসল আটকালো আর তুমি বয়ে দিতে যাচ্ছ ঘাড়ে ক'রে?'

'মোর ধান আমি যা খুশি করবো।'—

'আমি বলছি দাদা, শোনো'—

'তুই বলবার কে! তোর সাথে মোর কি সম্পর্ক আর।'

'কি বললে?'

'কোনো সম্পর্ক নাই।'

জীবন বউয়ের হাত ধরে চলে গেল বোঝা নিয়ে। ভুবন দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলো পথের মাঝখানে।

রাত হয়েছে অনেক। চরের ফসল তোলা মাঠ হা-হা করছে দূর থেকে দূরে। গ্রাম ঘুমন্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলো ভুবন। এগোচ্ছিল ঘর মুখো। ফিরে চললো আবার সে—যে পথে এসেছিল।

জীবন মালিকের কাছারি বাড়ীতে ধান পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

তার মতো আরও দু-একজন এমনি রাতারাতি গিয়ে ধান তুলে দিয়ে এসেছে। জীবন শুধু একা নয়। কাছারি বাড়ীর বিরাট উঠোনের কোণায় দেখে এসেছে সে ধানের গাদা।

তবু, আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে গেছে গ্রাম থেকে গ্রামে—আগুন লাগছে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। জোত জমি ছেড়ে পালাচ্ছে মালিকের নায়েব গোমস্তা পাইক, আগুন লাগছে কাছারি বাড়ীতে।

সে আগুন এ চরেও লাগলো।

মাঝ রাতে একদিন ঘুম ভেঙে গেল জীবনের। কান খাড়া করে শুনলো শাঁখের ডাক—ভেসে আসছে দূর থেকে। খালের উঁচু পাড়ের ওপরে শব্দ হচ্ছে ছুটন্ত পায়ে দুদ্দাড় ক'রে। জীবনের বউ ছুটে বেরিয়ে গেছল বাইরে। চেঁচিয়ে উঠলো সে।

'আগুন!'—

'কোথায় বউ?' হাতড়ে হাতড়ে জীবনও বেরিয়ে এসেছে বাইরে। কিন্তু কানা চোখে দেখা যায় না কিছুই।

জীবনের বউ বললো, 'ওই তো—কাছারি বাড়ীতে। জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে।'

'হায় হায় রে!—সর্বনাশ হলো মোর!—' জীবন মাথা চাপড়ায় আর গাল পাড়ে, 'এ সেই ভুবনার কাণ্ড। শালা হিংসায় পুড়িয়ে দিলে ধান কটা মোর। সব গেল বউ—সব গেল।'

'যাবে তুমি?'—

'যাবো!' জীবন হাউ মাউ করতে করতে বললো, 'খুনে ডাকাত মেরে ফেলাবে মোকে।'

'মোদের হক্কের ধান!'—

'কেমন করে যাব বউ, খাল পেরিয়ে! কানা মানুষ!'—

ঘরের সামনের খালটাই যত গেরো।

ভোর বেলা গিয়ে দেখলো জীবন—ধানের গাদা তার যেমন বসেছিল ঠিক তেমনি আছে। আরও যে কটি গাদা ছিল তাতেও লাগেনি আগুনের আঁচ। পুড়েছে শুধু কাছারি বাড়ী। কাগজ পত্র রেকর্ড পরছা—খেরো বাঁধান লম্বা লম্বা খাতাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে আছে। কোথায় পালিয়েছে নায়েব গোমস্তা তার চিহ্ন নেই। চেয়ে রইলো সে কাগজ পোড়া ছাইয়ের দিকে। পুড়েছে তার দু-কুড়ি পাঁচ টাকা, পনেরো মণ ধান আর সাত কুড়ি টাকার বলদ কেনার ধারের হিসেব। বহু শোষণের নথিপত্র।

অসম্ভব! সবটা অসম্ভব মনে হয় জীবনের।

আরও অবাক হলো সে যখন চরের মানুষ—কাচ্চাবাচ্চা মেয়ে মরদ ভীড় ক'রে আসে—গোলা ভেঙে ধান ভাগ করে।

ভীড়ের ভেতরে ভুবনকে খোঁজে তার চোখ। ভুবন নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে এক পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে সে। এগোতে সাহস হয় না। ধান ভাগ-বাঁটোয়ারা হচ্ছে মাথা-পিছু পরিবারকে পরিবার।

কার গলা ফেটে পড়লো উৎসাহে, 'লিয়ে লাও হে—মোদের বহু দুঃখের ধান। এবার ঘর লিয়ে চল।'

জীবন সাঁতরার ডাক পড়লো এক সময়ে।

'এই তুমার ধান—এই ভুবনের। লিয়ে চলে যাও।'—

বউ আর শালীকে ডেকে নিয়ে এসে ধান বইলো সারা সকাল জীবন। ভুবনেরটাও বয়ে আনলো ঘরে। এক পাশে তার ধান কাঁড়ি করে বললো :

'ওর ধানে হাত দিবিনি কেউ বলে দিলম। এসে বলবে ফের—চুরি করেছি।'

একদিন গেল, দু-দিন গেল—ভুবনের দেখা নেই। তার ঘর ফাঁকা। মাঠ ফাঁকা। সব কেমন ফাঁকা লাগে। ভুবনের কথা মনে পড়ে। চরের মানুষের মুখে শোনে সে—যত ফসল ফলিয়েছে তারা—সব এবার তাদেরি। এ মাটি তাদের, এ চর তাদের। পোড়া কাছারি বাড়ীটার দিকে চেয়ে চেয়ে একটা বিরাট পরিব্যাপ্ত সত্যকে সে যেন বোঝাবার চেষ্টা করে।—এ সবই তাদের। মনে মনে বলে : কিন্তু ভুবনা গেল কোথায়!—

তারপর ছুটে আসে একদিন ঘোড়সওয়ার ফৌজ পুলিস—এ গ্রামে নয়, পাশের গ্রামে। উড়ে উড়ে আসে নানান খবর আবার।

'ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেল চম্নপুরে।'

'ধরে নিয়ে গেল দশ জনকে পুব চক থেকে।'

'মরে গেল দু-জন গুলীতে।'

'তবে?'

'রুখবো—মোরা রুখবো। ধান মোদের—জমি মোদের। বলো, আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাবে মোদের এত কষ্টের ধানে? বলো?'

'পুলিসকে রুখছে দক্ষিণ চড়া।'

'মোরাও রুখবো।'

কিন্তু ভুবন কোথায় এর মধ্যে? জীবন খোঁজে তাকে। কেটে গেল ক'দিন। তারপর জিজ্ঞেস করলো সে ভয়ে ভয়ে একদিন ভুবনের এক সাঙাৎকে।

'ভুবন কোথায় বলো দিকিন?'

ভুবনের সাঙাৎ জীবনের দিকে তাকালো, ছোট ছোট চোখ করে। বললে, 'কেন বল দিকিনি?'

'এই এমনি।' জীবন বললো এমন ভাবে—যেন তার কোনো কৌতূহল নেই। শুধু একটা বাজে প্রশ্ন মাত্র।

'তাকে তো ধরে নিয়ে গেল পুলিসে পাশের গাঁ থেকে। জানোনি?'

'কি বললে?'

'ধরে নিয়ে গেল।'

'আমাকে তো কেউ বলেনি!'

হঠাৎ কেমন খারাপ লাগে জীবনের।

ঘরে ফিরে এসে ধানের কাঁড়ির দিকে তাকিয়ে আরও খারাপ লাগে তার। এই ধান আগলে থাকতে হবে তাকে—যতদিন না ভুবন ফিরে আসে। তার ভাগের ধান।

পরের দিন গিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করলো ভুবনের সাঙাৎকে:

'আচ্ছা, কবে ছাড়া পাবে সে?'

'ছাড়া পাবে কি—কি হবে তার ঠিক কি।'

'কি হবে আবার?'

'মেরেও তো ফেলচে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।'

'মেরে ফেলেছে তবে!'

'কি জানি!'

'কি রকম সাঙাৎ তুমি হে তার!' জীবন এবার চটে উঠলো, 'ধরে

নিয়ে গেল—আটকাতে পারলেনি তখন ? আবার বল, মেরে ফেলতেও পারে।'

'আমরা কোনো খবর জানিনি তার।'

ঘরে ফিরে গুম হয়ে বসে থাকে জীবন আবার। যতো বার চোখ পড়ে ধানের কাঁড়িটার দিকে—মনে পড়ে যায় ভুবনের মুখটা শুধু। বড় বিশ্রী লাগে। এই ধানের কাঁড়িটা যেন একটা শাস্তির মতো। অনবরত খোঁচা মারছে তাকে : হয়তো ভুবন মরে গেছে—ভাইটা মরে গেছে তার !

চরের ফসল তোলা শূন্য মাঠের মতো কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে জীবনের। ছটফট করে সে মনে মনে। একটা লোককে ধরে নিয়ে গেল—খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেললো হয়তো। কেউ কিছু করতে পারলো না !

এর মধ্যেই ছিটকে ছিটকে আসে নানান গ্রামের খবর :

'আবার মরে গেল দু-জন।'

'ধরে নিয়ে গেল চার জনকে।'

'মেরে ফেললো একজনকে খুঁচিয়ে খুচিয়ে। ফেলে গেছে বাঁধের ধারে। কার যেন বেটি গো !'

'সব ধান পুড়িয়ে দিয়ে গেল।'

শুনে শুনে এসে গুম হয়ে বসে থাকে জীবন এক ভাবে। সামনে দাওয়ায় ভুবনের সেই ধানের কাঁড়ি। ওতে পুলিস এসে আগুন দেবে হয়তো, আগুন দেবে তারও ধানে। আর ভুবনকে হয়তো মেরে ফেলেছে খুঁচিয়ে সেই বাঁধের ধারে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকা চাষীটার মতো।…

রাতে ঘুমোতে পারে না সে—ছটপট করে। কখন এসে পড়বে পুলিস কে জানে ! গ্রামের পর গ্রাম চষে বেড়াচ্ছে পাগলা ঘোড়া ছুটিয়ে।

সেই রাত্রেই অন্ধকারে আর্তনাদ করে উঠলো শঙ্খরোল।

জীবনের বউ আর শালী হাউ মাউ করে উঠলো, 'পুলিস এলো বোধ হয় গো !'—

'এঁ্যা—পুলিস ! পুলিস এসেছে ! শালা'—

জীবন ধড়মড়িয়ে উঠে হাতড়ায়—লাঠিটা খোঁজে। বহু দিনের ফাঁকা মনে-মনে খোঁজা একটা ব্যর্থ আক্রোশ পথ পেয়ে গেল যেন হঠাৎ। পেয়ে গেল লাঠিটা। তারপর আর কোনো কথা বলে না—বেরিয়ে যায় হুড়মুড় ক'রে। তারপর ছুটলো সে—ছুটলো কানা মানুষটা লাঠি হাতে ক'রে।

কিন্তু সামনে সেই খাল। ওপারে ছোটা মানুষের দুদ্দাড় পায়ের শব্দ। হাল্লা :

'হে ··· এ ... ই' ···

'হে ··· এ ··· ই' জীবন চিৎকার ক'রে সাড়া দিয়ে ছুটেছে এপারে।

'হায় হায় গো—গেল !' জীবনের বউ চিৎকার ক'রে ছুটলো খাল পাড়ের দিকে। কানা জীবন লাফ দিয়েছে ওপারে। ঘাড় গুঁজে পড়লো। উঠেছে—লাঠি ধরে আবার উঠেছে ওপারে :

'হে ··· এ ··· ই !'—

রুদ্রের তৃতীয় নয়নে আগুন। কানা জীবন সাঁতরা ছুটেছে শব্দ লক্ষ্য ক'রে কানা চোখে বোধ করি সেই আগুন জেলে।

চারদিক থেকে ভেসে আসছে শঙ্খরোল আর একটানা হাল্লার শব্দ। সমস্ত শূন্যতা আর অন্ধকার ভরে ভরে ওঠে ক্রুদ্ধ কণ্ঠের বলিষ্ঠ হাল্লায়।

পুলিস হটে গেল।

ঘর ফিরতি পথে খাল পাড়ে এসে থমকে দাঁড়ায় আবার জীবন। উঁচু পাড় বেয়ে নামতে হবে লাঠি ঠুকে ঠুকে। গা গরম হয়ে আছে তার তখনো। মাথাটা জ্বলছে। কাঁপছে গা। লাঠি ঠুকে ঠুকে সে নামলো এক পা। এমন সময়ে পেছন থেকে ডাকলো কে :

'থামো দাদা—পড়ে যাবে যে !'

'কে!'

'আমি ভুবন।'

'ভুবন! ছেড়ে দিয়েছে তোকে! মেরে ফেলেনি তোকে? এ্যা?'

'না দাদা—লুকিয়েছিলম। তোমাকে বলেনি পাছে তুমি বলে দাও কোথাও।'

'মোকে অবিশ্বাস! বুঝেছি।'

'বাদ দাও ওসব কথা দাদা। ধরো—হাত ধরো। নামো—আস্তে আস্তে নামো।' ভুবন হাত ধরলো জীবনের।

হঠাৎ বুকের ভেতরটা টন টন করছে কেমন জীবনের: ভুবন হাত ধরে পার করে দিচ্ছে তাকে কতদিন পরে আবার! সেই পিঠে ক'রে পার হ'য়ে যাত্রা শুনতে যাওয়া!—কতদিন হলো আর! এক বছর মাত্র।

তারপর কত কি ঘটে গেল।

ভুবনের হাত দুটো ধরে হাউ মাউ ক'রে হঠাৎ ছেলে মানুষের মতো কেঁদে উঠলো জীবন, 'ভুবন রে!'

ভুবন চুপ। তার বুকের মধ্যেও ঠেলে ঠেলে উঠছে একটা আবেগ।

'তোর ভাগের ধান আমি আগলে রেখেছি ভুবন। একটা দানা নষ্ট হতে দিইনি ভাই—' জীবন বললো আস্তে আস্তে।

ভুবন বললো, 'তার হিসেব এবার তুমিই রাখো দাদা।'

'ভুবন!' কিন্তু কিছু আর বলতে পারে না—জীবন হাত দুটো শুধু জড়িয়ে ধরে ভুবনের—অন্ধ আবেগে, কানা মানুষের গোঁয়ার বুকের কাছে।

'চলো দাদা—এগোও। সাবধান'—

খাল পার হয়ে এগিয়ে গেল দু-ভাই ঘরের দিকে। বহুদিন পরে আবার —এক সঙ্গে।

বউ

ঘর দোর সব নিকানো—ঝকমক করছে। আনাগোনা করছে দু-চারজন পাড়াপড়শী মেয়ে মরদ। হালকা কথা আর হাসি মস্করা—এদিক-ওদিক হাঁক-ডাক এক-আধটুক্ কারুর নাম ধরে। উৎসবের দিলখুশ মেজাজ সকলের। বর-বউ এখনও এসে পৌছয়নি। তাই এক লহমায় বোঝা যায়—সব কিছু তাদেরই অপেক্ষা করছে।

কে যেন বললে, 'অর্জুন এতক্ষণে বউ নিয়ে হাঁটা ধরেছে।'

'রোস—রোস।' কাঁথা মুড়ি দিয়ে দাওয়ার এক কোণে ঝিম মেরে বসেছিল বুড়ী গঙ্গামনি—কথাটা লুফে নিয়ে বললে, 'আসতে সেই এক পহর রাত।'

'বেলা তো গেল গো পিসি।'

'অাঁ? তবে ঢের দেরি।' ছানি পড়া সাদা সাদা কানা চোখ দুটো তুলে গঙ্গামনি বললো, 'যাই যাই করতেও সেই সাঁঝ পহরের শেয়াল ডেকে যাবে। বেটির বাপের ঘর থেকে আসা কি সহজ গা!'

'না গো পিসি—অর্জুনের সব টাইম ধরা কাজ। এসে পড়বে সন্ধ্যার আগে। দ্যাখ।'

'কত দ্যাখলাম বাপ—জানি।' বুড়ী তারপর হুঁ-হুঁ করে একটু হাসলো। বললো, 'মোর কি হল তবে শুন্।' ভাঙা দুমড়ানো কতগুলো বছর পেরিয়ে

অর্জুনের ঠাকু'মা গঙ্গামনি গিয়ে পড়ে কবেকার কথায়। ঝড় ঝাপটা খাওয়া ভাঙাচুরো মুখটায় ঝিলিক দেয় পুরাতন আমেজ। গঙ্গামনি তার শ্বশুরবাড়ী আসার কথা বলে। বরপক্ষ তাগিদ দিচ্ছে—উসখুশ করছে বর। ওদিকে মেয়ের প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার আগে কান্নার হাট বসে গেছে। মা-বাপ-ভাই গুষ্ঠিসুদ্ধ যে যেখানে আছে সকলের গলা ধরে ধরে কান্না—তারপর সামনে পাড়াপড়শী যে পড়ে তাদের গলা ধরে ধরে। পথ চলতেও সে কান্না থামে না—অমন দু-তিনটে গাঁয়ের পথ ডাক পেড়ে পেড়ে কান্না। শুনে ভিন গ্রামের লোক যাতে বলে দিতে পারে—'অমুকের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল গো।'

গঙ্গামনি বলে, 'তারপর তিন দিন মোর গলা বসে গেল।'

মাহিন্দ্রের বয়স ষাট ধরো ধরো—তবু গঙ্গামনির চেয়ে সে বয়সে ঢের ছোট। তবু সে সে-কালের লোক। হেসে বললে, 'একালে অত কান্নাকাটি নাই গো পিসি।'

'কি জানি বাপ্!' গঙ্গামনি ঠোঁট উল্টে বললে, 'একালে সব উল্টা। ঝাঁটা মারো।'—

বুড়ীর জরাজীর্ণ কালো মুখটা বিশ্রী বিকৃত হয়ে যায়। গর গর করে হুলো বেড়ালের ক্রুদ্ধ গোঙানির মতো। ক্ষেপে যায় একালের ওপরে। বলে, 'কাঁদবেনি কি গো! মেয়েমানুষ কাঁদবেনি কি! ছাতি ফেটে গেছে মোদের কাঁদতে কাঁদতে মা-বাপের দুঃখে, স্বামীর ঘরের ডরে। কি হবে না হবে—বাপ্ রে বাপ! বুড়া হয়ে গেছি এমনি করে। তবু চোখের জল শুকায়নি।'

ছানি পড়া ছলছলানো চোখ দুটো গঙ্গামনি একবার মুছে নিল ময়লা আঁচলে। কোন্ পুরণো কথা মনে পড়ে গেছে আবার। বকর বকর করে নিজের মনে।

ভিন্ গ্রামের কে একটি যুবক এসে দাঁড়াল এমন্ সময়ে মাহিন্দ্র মণ্ডলের

সামনে—চোখমুখ কেমন চন্‌মনে। বেশ খানিকটা পথ যেন ছুটে এসেছে সে। দম নিয়ে বললে, 'অর্জুন আসেনি এখনও ?'

মাহিন্দ্র হাসি হাসি মুখে বললে, 'সে যে বিয়ে করতে গেছে গো!'

'জানি মণ্ডল। কিন্তু এদিকে এক ব্যাপার ঘটে গেছে যে!'

'কি ?'

'হাটের পথ থেকে মোদের গাঁয়ের একজনকে ধরে লিয়ে গেছে জমিদারের লোক—গাওনার নাম করে।'

'বেদোর ব্যাটারা এখন মানুষজন গুম করতে লেগেছে তা হলে যে গো! এবার নিয়ে গেল কাকে ?'

'বৈরাগী বোষ্টম। জানোই তো—লোকটার মনের জোর নাই মণ্ডল—চাষ আবাদেরও মন নাই তার। গান গায় আর ভিখ মাগে। মোদের জ্বালা বুঝবেনি সে। মোদের সব কথা যদি বলে দেয়—অর্জুন গেছে বিয়ে করতে, কোন্‌দিক দিয়ে সে আসবে, কি করবে—যদি তাকে ধরিয়ে দেয়!'—

মাহিন্দ্র চুপ। ভাবছে। অর্জুনকে ধরার বহু চেষ্টা চলছে কিছুদিন থেকে—জমিদারের চর গোয়েন্দা আর পুলিস যেন পাগলা ঘোড়া ছুটিয়ে চষে ফেলছে গ্রামের পর গ্রাম।

'বলো মণ্ডল—তুমি মোদের মাথা, বলো এখন কি করি। অর্জুন তো নাই'—

অর্জুন নেই,—কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে মাহিন্দ্র মণ্ডলের চিন্তাতেও। চাষের ধান উঠে গেছে সব চাষীর ঘরে ঘরে মাঠ খালি করে। শূন্য মাঠ ছিপছিপে কাদায় পড়ে আছে আদিগন্ত। বিরাট জলার চারধারে ছড়ানো গ্রামগুলি শীতের পড়ন্ত বেলায় মিন মিন করছে। মাঠের সমস্ত জমি ভাগ হয়ে গেছে ওই ক্ষুধার্ত গ্রামগুলির মধ্যে। জমিদারের পোড়া কাছারি বাড়ীটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ীর মতো—তার পাইক-পেয়াদা, লোক-লস্কর সব কে কোথায় উধাও। সামনে যতদূর দেখা যায়—

সব এখন তাদেরই মুঠোর মধ্যে। এর চিন্তার দায়ও এখন তাদেরি। অর্জুন হলো সেখানে একটা শক্ত খুঁটির মতো। কিন্তু সে লোকটাই নেই।

মাহিন্দ্র বললে আস্তে আস্তে, 'সে আসবে কুমিরখালির চড়া দিয়ে—সন্ধ্যার আগেই এসে পড়বে।'

'বাস্। তবে মোরা সব উদিকে ঠিকঠাক রইলম মণ্ডল। অর্জুনকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেবো।'

লোকটি চলে গেল দ্রুত পায়ে।

মাহিন্দ্র মণ্ডল দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। সূর্য অস্তোন্মুখ। আকাশে কালো ছায়া নামছে আস্তে আস্তে। নোনা মাটির কাঁকড়া-পচা গন্ধের গুমোট শীত সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় ভারি হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। মনটাও ভারি হয়ে ওঠে ওইরকম—পুলিসী শঙ্কার নোংরা গন্ধে। মেজাজ এতক্ষণ হাল্কা হয়ে ছিল অর্জুনের বিয়ের উৎসবে। উঠোনের এক কোণ থেকে তখনও ভেসে আসছে বুড়ী গঙ্গামনির একঘেয়ে বকবকানি: 'কম কেঁদেছি গো! পেটে দানা পাইনি, কোমরে কাপড় পাইনি, তবু খেটে মরেছি শুধু জল খেয়ে খেয়ে। আর কেঁদেছি মাথা ঠুকে ঠুকে।'—

কথাগুলো কানে এসে লাগে মাহিন্দ্রের—হঠাৎ এক মুহূর্তে বুড়ীর কথাগুলো টেনে নিয়ে যায় তাকে কর্মক্লান্ত ক্ষুধার্ত নিঃস্ব দিনগুলোতে। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ে। অনেক কষ্ট পেয়েছে তারা—অনেক সয়েছে, অনেক মরেছে। আজ এক দিগন্তবিসারী জলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে—যার প্রতি ইঞ্চি জমি শুধু এখন তাদেরই, আর যেখানে খেটে খেটে মরে গেছে তার বাপ-ঠাকুরদা-প্রপিতামহ। এক মুহূর্তে সবটা অসম্ভব মনে হয়। এতগুলো গ্রাম, তার এত ক্ষুধার্ত চাষী, তার এত লড়াই, তার সভা সমিতি সব। সবটা স্বপ্ন বলে মনে হয়।

অত্যন্ত কঠোর সত্যের মতো এই সময়ে অর্জুনকে দেখা যায় জলার

পুবদিকে। আসছে বরযাত্রী দলবলের সঙ্গে। হলুদ চোবানো বর-কনের কাপড় ঝিলমিল করছে দূর থেকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মাহিন্দ্র।

মিতবর হয়ে গিয়েছিল পড়শীদের একটা বাচ্চা ছেলে। গঙ্গামনি তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে কনের বাড়ীর কথা।

'হাঁরে—খুব খাওন-দাওন হল ?'

'না—তেমন'—

'হবে ক্যামনে !' গঙ্গামনি কথা লুফে নিয়ে থর থর করে উঠলো, 'কুত্তা চাটার পাত যে। ঝাঁটা মারো। তা লোকজন এসেছিল অনেক ?'

'না তো'—

'মুয়ে আগুন। শ্মশান নাকি !' ফের সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করলো গঙ্গামনি, 'হ্যাঁ রে বউ খুব কাঁদলো ? এই ডাক পেড়ে পেড়ে'—

'কই না তো !'

'ঝাঁটা মারো। তবে মেয়া না ষাঁড়।'

'না গো—বউ খুব ভালো।'—

'দূর দূর—যা পালা।'—

আচমকা ঠেলা খেয়ে পালালো ছেলেটা। গঙ্গামনি গরগর করে রাগে। এমন সময় বর-কনে এল সামনে।

মাহিন্দ্র বলে দিল, 'আশীর্বাদ কর গো পিসি—তোমার শূন্য ঘর ভরলো এবার। দেখ—বউ দেখ, এই যে'—

'মোর কি চোখ আছে বাপ !'—

হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো বুড়ী—উথলে উঠে আণ্ডিকালের যত কথা—যত শোক। মরে যাওয়া স্বামী-পুত্রেরা, বাপ-মা, ভাই—যত প্রিয়জন ছিল সকলের নাম ডেকে ডেকে, ডাক পেড়ে পেড়ে কাঁদে গঙ্গামনি।

কাঁদে তার দিন গেছে বলে—সেদিনের মানুষেরা আর নেই বলে। সে কান্না আর থামে না।

বাড়ীতে বর-কনেকে নিয়ে উৎসবের আয়োজন—পাড়া-পড়শী জড়ো হয়েছে এসে। বুড়ীর ব্যাপারে উসখুশ করে সবাই। কান্না থামাতে পড়শী মেয়ে এল দু-চারজন, অর্জুন এল। মাহিন্দ্র এসে হাতে ধরলো, 'তোর পায়ে পড়ি পিসি—চুপ কর।' কিন্তু সমানে কেঁদে চলেছে বুড়ী—প্রাণপণে। যেন কান্না কাকে বলে—নতুন বউকে শুনিয়ে শিখিয়ে দেবে একবার।

শেষ পর্যন্ত নতুন বউ এল। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল পায়ে। বুড়ীর কান্না থামল। কিন্তু গোঁজ হয়ে বসে রইল চুপচাপ।

আর সবাই হারিয়ে গেছে আনন্দ হল্লার মাঝখানে। বুড়ীর কান্না থামিয়ে নতুন বউও উঠে যায় এক সময়ে। গঙ্গামনি কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থেকে ডাক পাড়ল, 'মাহিন্দ্র!'

মাহিন্দ্র কাছে এল, 'বল পিসি।'

'বউটা ধাড়ী।' গঙ্গামনি মন্তব্য করল। 'মোর বিয়ে হয়েছিল ন-বছর বয়সে।'

'বাপ রে, এখন চৌদ্দ বছরের নীচে বিয়ে হলে যে জেল জরিমানা হয়ে যাবে পিসি! সেদিন কি আর আছে?'

'নাই!' ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গঙ্গামনি বললো 'কিন্তুন এখন আবার জেল জরিমানা কি? তোদের সমিতি না পঞ্চায়েৎ, ডেকে ফের আইন কর তোরা।'

মাহিন্দ্র মাথা চুলকালো। বললো, 'একটু বাড়ন্ত গড়ন—নিজেই পছন্দ করেছে অর্জুন। মেয়েটিও ভাল গো পিসি। যেমন মাঠের কাজে তেমন ঘরের কাজে—সবটায় চৌকস।'—

'নূতন বউ কাজ করবে মাঠে! বল কি মাহিন্দ্র? মোকে বিয়ে দিল ন-বছর বয়সে। দু-ছেলের মা হওয়ার পরও মাঠে যাইনি।'

'সে-কাল কি আর আছে পিসি। এখন দুধের বাছাও খাটে—তবু সংসার কূল পায় না।'

'কি জানি বাপ্। মোকে বিয়ে দিল ন-বছর বয়সে।'...

গঙ্গামনি ফের শুরু করে কবেকার ন-বছরের কাহিনী। বুড়ীর কানা চোখে যেন ঠেসে ধরেছে আজকের দিনটায়—কবেকার সেই সব কথা।

'শ্বশুর ঘরে আমি তো ভয়ে ডরে মরি। এখন দেখ, নূতন বউ হ্যাঁ-হ্যাঁ করে ছুটছে ঘোড়ার মত। ঝাঁটা মারো।'

'কাজ আছে'—বলে মাহিন্দ্র পালালো।

উৎসবের কোলাহল থেমে এল এক সময়ে। এতক্ষণ অর্জুনকে নিয়ে তার ইয়ার বন্ধুরা নাচর-কুঁদন করেছে—হল্লা করেছে। পড়শী মেয়েরা নিয়ে পড়েছে নতুন বউকে। মেঠাই-সন্দেশের বদলে বর-কনেকে মাটির ঢেলা দিয়ে পিটিয়েছে ধপাধপ—পাঁক ছুঁড়েছে পুকুরের। গ্রামের সব চেয়ে প্রিয় মানুষটি আর তার নতুন বউ—দু-জনকে ঘিরে ছোট উঠোনটায় আনন্দের জোয়ার ডেকে গেছে। সমুদ্র ঘেঁষা কোন এক চরের ভাগচাষীর সামান্য এক বিয়ের উৎসব। কিন্তু এমন হল্লা তারা আর কখনো করেনি, এমন ফূর্তি আর কখনো হয়নি। এ গ্রাম আজ তাদের, এর প্রতিটি ইঞ্চি জমির মালিক আজ তারা। জমিদারের লটবহর উধাও হয়ে গেছে কোথায়। প্রাণ খুলে হেসেছে সবাই—গান গেয়েছে, নেচেছে অর্জুনকে কাঁধে করে। রাত দুপুর গড়িয়ে ঘরে ফিরেছে সবাই। মেয়েরা নতুন হাঁড়ির ভেতরে বাসর ঘরে জ্বেলে দিয়ে গেছে নতুন প্রদীপ। পড়শী মেয়েরা অর্জুনের বাসর ঘর সাজিয়ে গেছে পরিপাটি করে। বিছানার মাঝখানে শিলের নোড়া একটা শুইয়ে রেখে গেছে—তার দু-পাশে বর-কনে শোবে। তারপর সবটা নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকারে কোথায় শোনা যাচ্ছে শুধু গঙ্গামনির নাকের ফুরুৎ ফুরুৎ শব্দ।

বাসর ঘরের এককোণে বুক ভর্তি করঞ্জা তেলের প্রদীপ জ্বলছে একটা। তার ম্লান আলোয় বর কনে তাকাল মুখোমুখি।

অর্জুন মৃদু হেসে বললো, 'মুখের দিকে চেয়ে দেখ কি বউ? আমি কিন্তু বুড়া বর—এই দেখ, দাঁত নাই মোর।'

অর্জুন হাঁ করলো।

বউ ঘাড় নামিয়ে বললো, 'জানি। দুটা দাঁত নাই।'

'আগে জানতে?'

বউ ঘাড় কাৎ করে বললো, 'হুঁ, পুলিস তো ভেঙে দিয়ে গেছে।'

'তুমি জানতে সব?' একটা বীর্যবান আনন্দ হঠাৎ বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠছে অর্জুনের। শক্ত করে হাত দুটো সে চেপে ধরে বউয়ের।

বউ মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'মোর দাদা বাবা হয়তো তুমাকে বলেনি—ভয়ে। মোর বাঁ পাটায় কিন্তু তেমন জোর নাই—পুলিসের লাঠি পড়েছিল ধান কাটার সময়ে।—তুমি রাগ করবেনি তো?'—

'জানি—জানি—জানি।'—আর কিছু বলতে দেয় না অর্জুন—আর কিছু বলা হয় না। শুধু একটা বোবা আবেগ তোলপাড় করে ওঠে সারা দেহে—মনে। কথা সে বেশী জানে না—রূপ দিতে পারে না সে তার স্বপ্নের, কামনার। ভাষা নেই তার—প্রকাশ করতে জানে না সে নিজেকে। তবু তার হৃদয়ের সমস্ত অবরুদ্ধ আবেগকে প্রকাশ করার একটি পথ সে যেন খুঁজে পেয়ে গেছে আজ একজনের কাছে—সে তার সংগ্রাম, তার ক্ষতচিহ্ন-গৌরব। সেই পথে ফেটে পড়ে তার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যৌবন। সে বোঝে না সব কিছু। তবু, আজই প্রথম উপলব্ধি করে একটা খোঁড়া ষোল সতেরো বছরের মেয়ের লজ্জানত মুখের সামনে দাঁড়িয়ে—সে তুচ্ছ নয়, সে ঢের বড়। এই মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে সে ভেবে পায় না—দুটো শক্ত বাহুতে শুধু চেপে চেপে ধরে বুকের ওপরে গভীর আনন্দে।

আস্তে আস্তে সে বললো এক সময়ে, 'কাল থেকে বুঝে লাও তুমার সংসার বউ—আমি আর কিছু জানিনি। চাষের একটা বলদ আছে, তিনটা ছাগল আছে আর বাইরে আছে আমার ভাগের চোদ্দ বিঘা জমির ধান।'—

বউ চুপ ক'রে আছে। চোখে স্বপ্নের মতো ভাসছে তার প্রথম যৌবন-মোহের ঘর সংসার প্রিয়জন : সকালে গোরু ছাগলগুলোকে সে মাঠে নিয়ে যাবে। ভালো ঘাস দেখে বলদ দুটোকে বেঁধে দেবে। (আহা, একটি গাই গোরু থাকলে বড় ভালো হত)। ঘর-দোর নিকিয়ে পরিষ্কার করবে। এই লোকটিকে বলবে দু-কলসী জল তুলে-দিতে। বাঁ পাটায় তার তো জোর নেই! তারপর—তারপর, এই লোকটি কোথায় থাকবে তখন—কি করবে তাকে নিয়ে সারাদিন? কি করবে সে?—ঘুম আসছে না কিছুতে। জীবন কি—তা সে জানে না, এখনও বোঝেনি—মাধুর্য তার কোথায়। তবু আজ রাতে তার বৃহত্তর আর মহত্তর আশাগুলি নিয়ে সম্ভাবনা-সমুদ্রের হাঁটু-জলে সে একটা বাচ্চার মতো খেলা করে মনের আনন্দে।

রাতের দীর্ঘ প্রহরগুলি গড়িয়ে গেল কোন্ দিক দিয়ে।

শেষ রাতের দিকে ছুটে এলো আবার সেই ভিন্ গাঁয়ের ছোকরাটি। এসে ডাকাডাকি অর্জুন মণ্ডলের বাসর-ঘরে। অর্জুন বেরিয়ে এলো অবাক হয়ে।

'কি খবর গো!'

ছোকরা বললে, 'তোমাকে এখুনি পালাতে হবে এ গাঁ ছেড়ে।'

অর্জুন হেসে বললে, 'বাসর-ঘর আর নতুন বউ ছেড়ে?'

'কিন্তু পুলিস আসছে যে ধরতে। খবর পেয়ে গেছে ওরা অর্জুন। ক'দিনের জন্যে একটু গা ঢাকা দাও তুমি। খবর পেয়েছি ওরা ঘেরাও করবে আজই।'

'পুলিস মোদের বিয়ে-সাদির আনন্দ করতেও দিবেনি গো!'

দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নতুন বউ শুনছিল সব। অর্জুন ঘরে ঢুকতেই বউ জিজ্ঞেস করলো, 'পুলিস ?'

'হুঁ।' অর্জুন সায় দিল।

'পালাও তুমি তবে।'

'যাচ্ছি বউ।' অন্ধকারে পা বাড়ালো অর্জুন। বিছানার তলা থেকে কতকগুলো কি কাগজপত্র হাতড়ে নিল।

'দাঁড়াও একটু।'

মিটমিটে করঞ্জা তেলের প্রদীপটা খোঁচা খেয়ে জ্বলে উঠল আবার। সেই মিনমিনে আলোয় নতুন বউ গড় করলো অর্জুনকে। তারপর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'যাও।'

'কিছু যদি হয়'—

'তুমি যাও, কিছু ভাবতে হবেনি। চলো'—

পথ দেখিয়ে আগে আগে চললো বউ খিড়কীর দিকে।

খিড়কীর দরোজা পেরিয়ে থমকে দাঁড়ালো অর্জুন আবার। তাকালো বউয়ের মুখের দিকে একবার। মুখটা থম্ থম্ করছে শুধু। দুঃখ নয়—নয় নয়।

'যাও—দেরি কোরোনি আর!'—

প্রদীপটা দরোজার আড়ালে রেখে বেরিয়ে পড়ল বউ অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে।

'আমার ধান রইলো বউ—ঠাকুরমা রইলো।'

বউ বললে, 'তোমার সব আমি আগলে রাখবো—তুমি চলে যাও জোর পা চালিয়ে।'

তারপর ওরা এগিয়ে গেল পেছনের একটা খালের দিকে। কিছুটা গিয়ে বউ দাঁড়ালো। অর্জুন এগিয়ে গেল। গিলে ফেললো তাকে শীতের অগাধ অন্ধকার। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো বউ একা—অনেকক্ষণ। তারপর ফিরে এল ঘরের দিকে অন্যমনে।

বক্ বক্ করছে তখন গঙ্গামনি, 'এ কি বউ গো—এঁ্যা, অ মাহিন্দ্র! বলে কি না, যাও—যাও! বুক না পাষাণ গো! একবার কি হল মোর'—

কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল না গঙ্গামনি একবার—স্বামী কোথায় ক-দিনের জন্যে যাবে বলে বেরিয়েছিল। ঘুম ভেঙে উঠে সেই কথা পেড়ে বসে বুড়ী।

মাহিন্দ্র ছুটে এল, 'চুপ দে পিঁসি—পায়ে পড়ি তোর। বিপদ হবে। চুপ দে।'

'আ গো মা—আমি নিজের কানে শুনলম!'

'এখন চুপ দে পিসি—পুলিস এসে পড়লো বলে।'—

বউ তখন এসে দাঁড়িয়েছে অন্ধকার ঘরে। বিছানাটা খালি—একজন ছিল কিছুক্ষণ আগে। ঘরটা খালি—যার ঘর সে নেই। সবটা কেমন খালি খালি লাগছে। একজন ছিল। একজন নেই। কান্না পাচ্ছে না। চেয়ে আছে অন্ধকারে। তার বাসর ঘর!—তার এক রাত্তিরের সংসার!

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। খবর রটে গেল—ধরা পড়ে গেছে অর্জুন। তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সেপাই আর জমিদারের দালালেরা।

মাহিন্দ্র তখন চুল টানছে নিজের—ক্রোধে, ক্ষোভে, 'এ সেই শালা বৈরাগীর কাজ।'

'ধরেছে।' নতুন বউ শুধালো দম বন্ধ ক'রে।

'হ্যাঁ—ধরে ফেললে গাঁয়ের শেষ জঙ্গলের কিনারে।'

নতুন বউ ছুটলো সেই দিকে বাসর ঘর ছেড়ে।

ছুটে গিয়ে দুই হাতে শক্ত করে চেপে ধরে অর্জুনকে। একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। ছাড়বে না সে—ছাড়বে না। তার কুমারী জীবনের বহুদিনের আশা, তার মাত্র একটি রাত্রির স্বপ্ন—তার অপরিপূর্ণ অনাগত জীবন! শক্ত মুঠি চেপে বসে জোরে অন্ধ আবেগে।

ঝটাপটিতে হলুদে চোবানো শাড়ীটা লটপট করছে মাটির ওপর—ঝিলমিল

করছে। পড়শী মেয়েরা একবার তাকালো পরস্পরের চোখে চোখে। তারপর ছুটে গেল হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে।

'তবে রে গুলামের ব্যাটা!'—

এমন সময় বহু দূর থেকে হাল্লার আওয়াজ শোনা যায়: হো··· ও··· ও··· ও।

অগণিত মানুষের কণ্ঠ একটা সম্মিলিত ঐকতানের মতো ছুটে আসছে এই দিকে—উর্ধ্ববেগে। বুকের ভেতরে কোথায় যেন ওটা দম আটকে ছিল—আজ নাড়া পেয়ে ফেটে পড়ছে কণ্ঠে কণ্ঠে। পুলিসগুলো সচকিত হয়ে কান খাড়া করে শুনলো, দালাল গোয়েন্দারা সভয়ে মুখ চাওয়া চাউয়ি করে। তারপর সবাই মিলে আর একবার হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অর্জুনকে। বউ শক্ত করে চেপে ধরে আছে তাকে।

অন্যান্য মেয়েরা এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো বেয়নেটধারী পুলিসগুলোর ওপরে। শক্ত হাতে টান মারে বন্দুক। বহু দূরের শব্দটা ছুটে আসছে এবার কাছাকাছি তীরবেগে: হো—ও ··· ও ··· ও। ···

পট্ পট্। ···

হাওয়ায় রাইফেলের শব্দ ফেটে পড়ে এবার। পুলিস রুখে দাঁড়িয়েছে। চোখে ভয় তাদের—হাল্লার শব্দটা ছুটে আসছে দানবের মতো জলা জঙ্গল গ্রাম-গ্রামাঞ্চল ভেঙে। এসে পিষে ফেলবে যেন. তাদের। হাল্লা এবার জলার পুবে। আরও কাছে। ছুটে চলে গেল ভয় পাওয়া পুলিসের দল রাইফেলের গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে। ছোট ছোট ধোঁয়ার পুঞ্জ ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেল উত্তুরা বাতাসে।

হলদে শাড়ীপরা বউটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে।

'বউ—অ বউ!' একটি মেয়ে এসে চিৎ করে ফেললো বউকে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'হায় মাগো!—'

বুকের কাছে হলদে শাড়ীর ওপরে বুলেট ভেদ করে যাওয়ার চিহ্ন। হলদে শাড়ীতে লেগেছে পোড়ার দাগ। অর্জুন চেয়ে আছে: ওইখানে কাল সে পাগলের মতো মাথা গুঁজেছিল না!

চেয়ে আছে সবাই: কাপড়ের হলুদ রং ফিকে হয়নি একটুও, হাতের কব্জিতে সুতোয় বাঁধা দুর্বা ঘাসের গায়ে এখনও লেগে আছে শ্যামলের আভা, কপালের ওপরে সিঁদুরের ড্যাবড্যাবে টিপ একটা ভারী মিষ্টি করে তুলেছে কচি মুখটাকে।

অর্জুনকে টেনে হিঁচড়ে ছিনিয়ে আনতে গিয়ে মরে গেল বউটা: মাহিন্দ্রের কাছে সব কথা শুনে বুড়ী গঙ্গামনি গোঁজ হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠলো গলা ছেড়ে:

'মোর ঘর যে তবে শূন্য পড়ে রইল মাহিন্দ্র!—মোকে লিয়ে চল সেখানে একবার। দেখবো আমি—মোর বউ দেখবো। মোর সোনা বউ। মোর যে দেখা হয়নি রে মাহিন্দ্র!'—

মাহিন্দ্রর হাত ধরে ধরে গিয়ে এতক্ষণে নতুন বউ দেখলো বুড়ী গঙ্গামনি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদরে, সস্নেহে।

জনক

১

প্রথম মানুষ এসেছিল সে। আমবাগানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁ-করে চেয়েছিল ঘুঘুডাঙার মাঠের দিকে। সারা মাঠ ভরে গেছে আগাছা আর বুনো ঘাসে। চেয়ে চেয়ে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল। উদ্‌ভ্রান্ত তার দৃষ্টি। মাথার চুলগুলো সব সাদা। মোটা মোটা এক জোড়া সাদা ভুরু। গায়ের চামড়া শিথিল হয়ে গেছে, গালের দু-পাশে ঘোড়ার লাগামের মত বয়সের রেখা। তবু এই বেঁটে মানুষটির চওড়া চিবুক, চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বক্ষপট—সবটা মিলিয়ে মনে হয়, একটা অফুরন্ত কর্মঠ বলিষ্ঠতা চাপা আছে তার শিথিল চামড়ার তলায়। মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার তাকাল সে ছায়াচ্ছন্ন আমবাগানের দিকে। এদিকে উঁচু ডাঙা। জঙ্গল আগাছায় ভরা, কতকগুলো ঢিপি বুক চিতিয়ে আছে এখানে ওখানে। তারই লাগাও ঘেঁটু জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা শেয়াল নিঃশঙ্কচিত্তে চলে যেতে যেতে অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল এই পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত বুড়োটার দিকে চেয়ে। একটা গিরগিটি মাথা নাড়ল।

সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

যত দূরে চাও—একটা মৃত ভূখণ্ড, অনুর্বর—বন্ধ্যা। কোন এক কালের পায়ে চলা গেঁয়ো পথ চাপা পড়ে গেছে বুনো ঘাসের তলায়। এখানে ওখানে উঁচু উঁচু বাস্তু ঢিপি। সমস্ত মানব-চিহ্নের বিস্তৃত একটা গোরস্তান। কোন

এক কালের কথার সঙ্গে সঙ্গে উর্বর মৃত্তিকার প্রসবের ইতিহাস থেমে গেছে যেন আরণ্যক অনুর্বরতায়।

তারপর এ মৃত ভূমিতে সে-ই এসে দাঁড়াল প্রথম। জমির মালিকের সঙ্গে দেখা করল, একাই খেটে খুটে টঙের মত কুঁড়ে তৈরি করল একটা। তারপর একদিন সকালে বেরিয়ে চলে গেল কোথায়। মৃত বনভূমি মরে পড়ে রইল সারাদিন। সন্ধ্যে বেলা ফিরে এল সে—সঙ্গে আর একজন যুবক। তার পরের দিন থেকে লোক আসতে লাগল দলে দলে—কাচ্চা বাচ্চা মেয়ে মরদ। জঙ্গল আগাছা কেটে ঢিপি খুঁজে খুঁজে এক একটা টঙ তুললো বুনো মানুষদের মতো। এল তারপর বলদ, গোরু, ছাগল। মৃত মৃত্তিকার কোল জুড়ে উঠল এবার মানুষ আর গৃহপালিত পশুর কলধ্বনি। আদিম অরণ্যের মৃত স্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে যেন শেষ হয়ে গেল।

শুরু হল বন্ধ্যা বসুন্ধরার নতুন এক অধ্যায়। পৃথিবীর সে এক পুনর্জন্মের কাহিনীর মত।

ঘুঘুডাঙার মাঠের বুনো ঘাস আর আগাছা সাফ করে মৃত্তিকার জন্মদাতারা লাঙল বলদ নিয়ে মাঠে নামল এবার। আকাশে তখন মৌসুমী মেঘ দেখা দিয়েছে। বেসরকারী একজন আমিন ডেকে এনে জমি ভাগ করে চৌহদ্দি সীমার দাগ দিয়ে শুরু হল জমি চষা।

কিন্তু মাটি তো নয়—পাষাণ। লাঙলের ফলা বিঁধছে না মাটিতে, ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে। দক্ষ হাতের সমস্ত কৌশল ও অবশিষ্ট বার্ধক্যের সমস্ত জোর দিয়ে সে দু-হাতে চেপে ধরেছে লাঙল, টানের চোটে বেঁকে গেছে বলদ দুটোর শিরদাঁড়া।

চরণ বলে উঠল পাশের জমি থেকে, 'ক-বছরে মা বসুমতী পাষাণ হয়ে গেছে পরধান।'

হলদে দাঁতগুলো দিয়ে চেপে ধরেছে সে নীচের ঠোঁটটা। দম চেপে বললো শুধু, 'চেপে ধরো লাঙল জোরে।'

অন্য আর একটি জমি থেকে একটি যুবক বলে উঠল, 'মোর লাঙল ভেঙে গেল পরধান—হায় দেখ।'

'কোদাল ধরো তবে।' সে আবার বললো, 'শালারা দুরমুস দিয়ে পিটিয়ে চট ফেলে দিয়ে গেছে—ফেড়ে বিদ্রে দাও।'

ঘুঘুডাঙার মাঠে এরোপ্লেন নামত যুদ্ধের সময়—বোমারু বিমান। বাঙলার প্রান্তসীমায় তখন চলছে জাপানী আক্রমণ। বঙ্গোপসাগরের ধার-ঘেঁষা এ এক গ্রাম। জঙ্গী বিমান বহরের এ ছিল এক অগ্রবর্তী ঘাঁটি। ঘুঘুডাঙার এবড়ো খেবড়ো মাঠটাকে পিটিয়ে চৌকোস করা হয়েছিল একদিন। কোথাও বসানো হয়েছিল খোয়া। ফালের মাথায় উঠছে সব।

খোয়া বাছতে বাছতে ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে উঠছে চাষীরা। আড়চোখে দেখল সে একবার সকলের পরিশ্রান্ত মুখগুলো। নিজের লাঙলের মুঠোটা চেপে ধরে বলে উঠল আবার: 'ফেড়ে বিদ্রে দাও।'

'কিন্তু বলদ যে টানতে পারছে না পরধান!'

কে একজন বললো, 'তার চেয়ে আগে কোদাল ধরো।'

সে বললো, 'তাই ধরো। প্রাণ দাও—মা বসুমতীকে প্রাণ দাও সবাই।'

ওপরের অনুর্বর মাটির কঠিন চটের ওপর এবার কোদাল পড়তে লাগল ঝপাঝপ করে। হঠাৎ কার কোদালে ঠন্ করে আওয়াজ উঠল। মাটির ভেতর থেকে উঠছে সিমেন্ট জমানো খুঁটি, মাইলস্টোনের মতো, তাতে ইংরেজি অক্ষরে কি সব সাংকেতিক চিহ্ন দাগা। লোকটা বলে উঠল, 'এতে যে কি সব লেখা আছে পরধান, কি করব!'

সে বিরক্ত হয়ে বললো, 'কোদালের পাশায় ভেঙে ফেল না।'

'সায়েবদের কি না-কি, মালিক কিছু বলবে না তো?'

সে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো, 'বলবে আবার কি !'

'মালিক যে বলেছিল, মিলিটারীর কোন কিছুতে হাত দেবে না !'

'তোর নিকুচি করেছে।' সে ক্ষেপে উঠে বললো, 'এ মোদের ফসলের মাঠ, বন্দোবস্ত নিয়েছি ফের। এর মধ্যে শালাদের যা কিছু আছে, সব উপড়ে ভেঙে ফেড়ে এবার শেষ করে দে।'

দূর থেকে আর একজন হেঁকে বললো, 'মড়া বেরোলো পরধান—এই ছাখো সার সার হাড্ডি পাঁজরা।'

একটা আস্ত মানুষের কঙ্কাল।

কার ? ···

সে থমকে মুখ তুলে তাকাল কয়েক মুহূর্ত। ভাবতে লাগল : কার কঙ্কাল ? হারানের ? বাতাসীর ? না—সাধুর ? ঘুঘুডাঙার মাঠের মৃত্যুর ইতিহাসের সঙ্গে বহু মানুষের কথা জড়ানো ছিল। সুখ দুঃখে জড়ানো সে এক সুদীর্ঘ অতীত। তার সামনে হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল লাঙল বলদ নিয়ে। তারপর হঠাৎ যেন ক্ষেপে গিয়ে বলদের ল্যাজ মুচড়ে খিস্তি করে উঠল :

'টান শালা—টান—টান--'

লাঙলের ফাল যেন গেঁথে গেছে কিসে না কিসে। মাটি চাড়া দিয়ে ফালের মুখে উঠল একটা পেতলের চোং—বিঘৎখানেক হবে। এ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ গানের বুলেটের খোল। ওটার দিকে চেয়ে আর একবার সমস্ত অতীত ঝিকিয়ে ওঠে ওর চোখের সামনে। দমাদ্দম লাথি মারে সে খোলটার ওপরে। দাঁতে দাঁত চেপে খিস্তি করে।

প্রতিটি অতীত চিহ্ন তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। বিকেলের দিকে দেখা যায় আবার—বনবাদাড়ের ভেতরে সে ক্ষ্যাপার মতো দাঁড়িয়েছে রুখে। বাঁশের পাত তুলে চিকন বুনোটের কাজ, এখন ভেঙে জীর্ণ হয়ে গেছে। ঘিরে

আছে হাত চারেক জায়গা। তারই ওপরে ল্যাথি মারছে সে দমাদ্দম আর খিস্তি করছে। লাথির চোটে সবটা ভেঙে পড়ল মড়মড় করে।

এমন সময় পেছন থেকে কে হেসে উঠল। বললো, 'আরে কর কি—কর কি পরধান!'

পরধান ঘুরে দেখল—পিয়ন জানকীনাথ। জানকীনাথ হাসতে হাসতে বললো, 'মনে হল—ক্ষেপে গেছ যেন গো।'

বাঁশের পাত তোলা চিকন বুনোটটার দিকে আঙুল তুলে পরধান বললো, 'মোর ধানের মরাই ছিল পিয়ন! ভ্যাখো শালাদের কাণ্ড, তাকে ভেঙে পাইখানা করেছে। রাগ হবে না!'

'ঘুঘুডাঙার সব জঙ্গল কিন্তু আবার সাফ করে ফেললে তোমরা পরধান! মনে হচ্ছে যেন আবার সেই গ্রাম!' পিয়ন বললো।

পরধান একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'সে গাঁ আর কোথায় দেখছ পিয়ন! কত মানুষ-জন ছিল কোথায় গেল সব!'—

পিয়ন বললো, 'তবু তো কতদিন পরে আজ ফের যাচ্ছি সেই গাঁয়ের ভিতর দিয়ে গো! এতদিন তো বনবাদাড় হয়ে পড়েছিল!'—

'তবু কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে পিয়ন।' পরধান বললো, 'কত লোকের যাওয়া-আসা ছিল, গম-গম করত এই পথটা। বলো! এই পথে তোমাকেই তো দেখলাম কত দিন পরে পিয়ন!'

'আসতে আসতে তাই মনে হচ্ছিল পরধান।'

'তুমি এই পথে আসতে যেতে, বসতে মোর ঘরের দাওয়ায়, গপ্প করতে কত দেশের, তামুক খেতে।' পরধান বলে চললো, 'কোথায় গেল সে-সব দিন পিয়ন, কোথায় গেল মোর সেই ঘর! এখন দেখ—ওই বেঁধেছি একটু টঙের মত।'—

'আবার হবে—সব হবে পরধান।' পিয়ন বললো, সান্ত্বনা দেওয়ার মত করে।

পরধান হাসলো—আত্মঘাতী বিদ্রূপের মতো। বললো, 'হবে! না পিয়ন—আমার সব গেছে। চল পিয়ন—তামুক খাবে চল। কতদিন পরে দেখলাম তোমাকে।'

পিয়নকে বসিয়ে তামাক সেজে দিল পরধান। বসল পাশে পুরনো দিনের মত। আগে এমনি করে হাঁক-ডাক করে পিয়নকে ধরে এনে বসাত পরধান—জিজ্ঞেস করত দুনিয়ার খবর। জানকীনাথও আসত তামাকের লোভে—অনেক হাঁটতে হয় তাকে, অনেক ঘুরতে হয়, দরকার হয় নেশার। জানকীনাথ তামাক খেত আর দুনিয়ার যত আজগুবি খবর বলত—কখনো খবরের কাগজ থেকে, কখনো বানিয়ে বানিয়ে। সে সব খবর ছিল একটা গোরুর তিনটে বাছুর, অথবা একটা মেয়ে কোথায় চারটে ছেলে বিইয়েছে এক সঙ্গে, না হয় কোথায় অসম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেছে,—এই সব নিয়ে। সে দিন নেই, সে মেজাজ নেই, বরং পরধান আজ জিজ্ঞেস করলো : 'যুদ্ধ তাহলে থামল পিয়ন—কি বল ?'

'হাঁ গো পরধান, সে তো আজ তিন চার বছর হয়ে গেল। দুনিয়ার কত জায়গা ছারখার হয়ে গেছে। কত লক্ষ লক্ষ লোক মরে গেল—শ্মশান হয়ে গেল সব।'

'সব ঘুঘুডাঙার পোড়ো ভিটা বলো!' পরধানের কথায় শুকনো শ্লেষ।

'সেই রকমই পরধান।'

পরধান শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। আগের দিনের মত কোনো আষাঢ়ে গল্প নিয়ে তেমন আর জমে না। তামাক খাওয়া শেষ করে চলে গেল পিয়ন।

পরধান এক ভাবে উবু হয়ে বসে এক-মনে তামাক খেয়ে যাচ্ছে। কেমন অন্যমনা। এক সময়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাঁ-ক'রে চেয়ে রইল সে শূন্য দৃষ্টিতে। সামনের মাঠ জুড়ে নেমে আসছে বিকেলের বিষণ্ণ ছায়া। পরধানের

মনটাও ওই রকম আস্তে আস্তে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। গ্রামটা বড় নির্জন মনে হয়, বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কবেকার কথা যেন মনে পড়ে: এই সময়ে কচি ছেলে-মেয়েদের কান্না-কলকাকলী—ছোকরাদের আখড়ায় ঢোলের ওপর চাঁটি—একটি দুটি নারী কণ্ঠ—একটু হাসি। সবটা মিলিয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের প্রশান্তি—ভালবাসা—জীবন! সে সবগুলো আজ স্বপ্ন বলে মনে হয়। তার ছোট টঙটুকু নীরব নিথর নির্জন। সামনে এখানে ওখানে মাথা তুলছে গুটি কয়েক টঙ মাত্র। গ্রামের কে কোথায় সব ছিটকে গেছে। ফিরে এসেছে কেউ কেউ জমি বিলির খবর পেয়ে—আসছে এখনও দু-একজন করে। তবু গ্রামটা ফাঁকা লাগে। সর্বহারা জনকের ফাঁকা বুক সহজে ভরে না: পরধানের এ যেন সেই শূন্যতার জ্বালা।

এমন সময় একটা গোলমাল শোনা যায়। কে যেন তর্জন গর্জন করছে আর কে কাঁদছে ডুকরে ডুকরে। পরধানের মন চলে যায় সেই দিকে।

২

বদির বউ ভুতি অনেক পথ এসেছিল হেঁটে হেঁটে—আবার সেই ঘুঘুডাঙার গ্রামে। হাত-পাগুলো কাঠির মত সরু সরু, তাতে উঁচু পেটটা দেখাচ্ছে আরও বড়। কেমন সিটিয়ে যাওয়া চেহারা। অনেক পথ হাটকে এসেছে —কোন লালমাটির সড়ক, লাল ধুলোর আস্তর পড়েছে সর্বাঙ্গে। ক্লান্ত ধূলিধূসর।

গ্রামের যে ক'টি মেয়ে ফিরে এসেছে তারা চিনতে পারেনি প্রথমে।

সে বলেছিল ম্লান হেসে, 'আমি ভুতি। মোকে চিনতে পারলেনি!'

মেয়েরা অবাক হয়ে বলেছিল, 'কোথা থেকে এলি লো?'

'সে অনেক দূর—ইস্টিশান। খবর পেলম গেরামে আবার সব ফিরে এসেছে। তাই আমিও চলে এলম।'

'বদি এলোনি ?'

'সে তো ছেড়ে পালিয়েছে মোকে ক-মাস হল !'

'ও মা !'—

গভীর অভিনিবেশে শোনে মেয়েরা। তারপর তার উঁচু পেটটার দিকে চেয়ে যেন পরস্পর চোখে চোখে কথা কয় ওরা। একটি মেয়ে দেখিয়ে দিল, 'ওই হোথায় তোর শ্বশুর টঙ তুলেছে।'

ক্লান্ত অবসন্ন পা দুটো টেনে টেনে ভুতি গিয়ে দাঁড়াল শ্বশুরের টঙের সামনে। হায় রে, এই ছিল তার স্বামীর ভিটে।—তার প্রথম যৌবনের নিশ্চিন্ত ঘরের কোণ !

'কে !' তাকে দেখে বেরিয়ে এল তার শ্বশুর। ভুতি তখন আর দাঁড়াতে পারছে না—বসে পড়েছে। শ্বশুর গজেন মণ্ডল তাকে দেখে মারমুখো হয়ে উঠলো, 'পালা পালা কালামুখী !—তোর এখানে আর কি !'

ভুতি বসে রইল মুখ নীচু করে। তার শ্রান্ত মুখে পালাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

গোলমালে গ্রামের মেয়ে মরদ সবাই জড়ো হয়েছে এসে একে একে।

গজেন বললে, 'পাপ এনেছে পেটের ভিতর পুরে। দূর হ হারামজাদী।'

কে একজন বললো, 'ও পাপ তো তোমার ব্যাটারই গো।'

'মোর ব্যাটার !' গজেন বললো, 'সে আজ চার বছর ফৌত। ও কোন ইস্টিশানের কাছে খানকিগিরি করত, আজ বেসামাল দেখে ছুটে এসেছে এখেনে।'

একটি মেয়ে বললে, 'ভুতি যে তবে বললো—বদি এই ক-মাস হল কোথায় চলে গেছে !'

'ক-মাস না ক-বছর !' গজেন রুখে এল—যেন ভুতিকে পেটাতে শুরু

করবে এবার। বললো, 'বলুক ও বুকে হাত দিয়ে তোমাদের সামনে ভগমানের নাম করে! আমি ওর সব খবর জানি। বলুক ও।'

ভুতি বসে রইল এক ভাবে মুখ নীচু করে। তার মুখে অপরাধ—ভয়।

গজেন বললে, 'এখুনি দূর হ' কালামুখী। তোর কথা পরধান একবার শুনতে পেলে মোকে একঘরে করবে—ঘর জ্বালিয়ে দেবে মোর। সে বড় কঠিন লোক।'

সবাই বললে, ইটা ঠিক কথা বলেছ বটে!'

'বল তোমরা!' গজেন বললে, 'এই যে ও ভিটেতে এসে পা দিয়েছে—এতেই সে কি করে বসবে তার ঠিক নাই। উঠে যা—পালা মোর ভিটে ছেড়ে।'

বিকালের ছায়াম্লান আলো তখন কালো হয়ে আসছে। ভুতি অসহায় ভাবে তাকালো একবার শ্বশুরের কঠিন মুখটার দিকে। আবার ফিরে যেতে হবে কোথায় না কোথায়—ক্ষুধায়, সংশয়ে, নিরুদ্দেশ জীবনে—এ যেন সে আশা করে আসেনি।

গজেন বিব্রত হয়ে বললে, 'এ পাপকে গ্রাম থেকে তোমরা সব বার করে দাও। না হলে পরধান মোর সর্বনাশ করে দেবে।' বলে সে যেন সাহায্যের জন্য তাকালো সকলের মুখের দিকে।

এমন সময় গোলমাল চেঁচামেচি শুনে পরধান নিজেই এসে দাঁড়াল সেখানে। সবাই সরে গেল পরধানের সামনে থেকে। তাকে দেখে ছুটে এল গজেন। হাউ মাউ করে বললে, 'ও নিজে এসেছে পরধান—আমি আনিনি। ভগবানের দিব্যি।'

'হলো কি গজেন!'

'এই ত্যাখো পাপ।'

গজেন বুঝিয়ে বললে সব ঘটনাটা।

সবাই চেয়ে আছে পরধানের মুখের দিকে—অপেক্ষা করছে পরধানের ক্রোধ : ভুতির কপালে আজ অনেক দুর্দশা আছে। থমথম করছে পরধানের মুখটা কালবৈশাখীর মেঘের মত। ঝুলে পড়া শাদা ভুরুর তলা থেকে একজোড়া ঘোলাটে দৃষ্টি এক ভাবে চেয়ে আছে ভুতির দিকে। ভুতি ফিঁচ ফিঁচ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল, সেও থেমে গেছে ভয়ে। সব চাতুরি ধরা পড়ে গেছে যেন তার। হঠাৎ সে যেন প্রাণভয়ে হাউমাউ করে গিয়ে জড়িয়ে ধরল পরধানের পা দুটো।

'কোথায় যাই পরধান—গ্রাম ছেড়ে কোথায় যাব আমি! আর কখনো যাবিনি পরধান—আর কখনো—'

পরধান একটি কথাও বললো না। পা ছাড়িয়ে ভিড় ঠেলে চলে গেল নিঃশব্দে। গজেন মরিয়া হয়ে ছুটলো পেছনে পেছনে, 'মোর কোন দোষ নাই পরধান, ভগমানের দিব্যি—ও পাপকে আমি ডাকিনি। ও নিজে এসেছে। বল, হারামজাদীকে চুলের মুঠি ধরে বার করে দি।'

পরধান ফিরে শুধু একবার বললো, 'ভারি মানুষ—রাতে আর কোথায় যাবে গজেন!'

এ ধরনের কথা আশা করেনি গজেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। পরধান চলে গেল এগিয়ে একা। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না গজেনের। সকলের স্তব্ধ বিস্ময়ের মাঝখানে চাপা কলগুঞ্জন চলতে লাগলো একটা।

নিজের টঙে ফিরে এসে গুম হয়ে বসলো পরধান।

গ্রামের মেয়ে আর মরদ তখনো জটলা পাকাচ্ছে ভুতিকে ঘিরে। তার মধ্যে গজেনের দিব্যি-গালা গলা ছাপিয়ে উঠেছে সবাইকে। এর সঙ্গে মিশে মিশে যাচ্ছে ভুতির ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। সবটা আজ কেমন যেন খাপ-ছাড়া লাগে পরধানের—কেমন যেন হঠাৎ তালকাটা। সে মাতব্বর! একটা কথা শুধু ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগল তার : ঘুঘুডাঙায় আবার ফিরে

আসছে একে একে সবাই। তবু সবটা খাঁ-খাঁ করছে পরধানের চারপাশে। এবং সে একা—তার আর কেউ ফিরে আসবার নেই হয়তো।

অতীত উঁকি মারে।

আজকের বুনো টঙের ওপরে ঝকমক করে একটি সম্পন্ন চাষীর চিকন উঠোন, দাওয়া, মরাই—ধানের গাদা। কলকাকলী ওঠে অসংখ্য ছেলে-মেয়ের। ছ-মেয়ে ছ ছেলে নাতিপুতি। সবাই জড়ো হয়েছে নবান্নের উৎসবে—চাষীর ঘরের দিলখোলা উৎসব। কেন যেন হাসছিল সবাই—মনে নেই। সে এসে পড়েছিল তার মাঝখানে। ছেলে-মেয়ে নাতি-পুতি, দু-ছেলের দুই বউ—সবাই হাসছে।

'হলো কি!' সে জিজ্ঞেস করেছিল।

হাসি আবার উছলে উঠলো।

সারা ঘরে আলপনা আঁকা। শ্রী ছিল, শান্তি ছিল—ছিল জীবনের নির্ভর! উছলানো হাসি-হাসি মুখগুলির দিকে চেয়ে সে-ও হেসেছিল। এমন সময় মাথার ওপরে একটানা কড়্ কড়্ শব্দ! আকাশ থেকে যেন কোন সমূহ সর্বনাশ নেমে এল মাথার ওপরে! ছেলেমেয়েরা ছিটকে বাইরে বেরিয়ে গেল। হতবুদ্ধি হয়ে সে নিজেও বেরিয়ে গেল বাইরে।

'ওই যে—ওই যে চলে যাচ্ছে! ওমা!—'

উড়ো জাহাজ। খুব নীচু দিয়ে যাচ্ছে! ঘুঘুডাঙার ওপর দিয়ে সেই প্রথম উড়ে গেল উড়ো জাহাজ! গ্রামের মেয়ে-মরদ কাচ্চাবাচ্চা চেয়ে রইল বজ্রঘাতী বস্তুটার দিকে।

তারপর গা সওয়া হয়ে গেল ওটার নিত্যকার যাওয়া-আসা। গ্রামের মাতব্বরকে সবাই জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওটা ওই একদিকে রোজ কোথায় যায় বল দেখি পরধান?'

'ওদিকে সাগরে বোধ হয় চিংড়ি মাছ আনতে যায়।'.

এর কিছুদিন পরেই দাঁড়ি মাঝি বড় দুই ছেলে অসময়ে ফিরে এল ঘরে। পরধান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'চলে এলি যে।'

'সরকার সব লা-লৌকা কেড়ে নিয়েছে।'

'কেন ?'

'যুদ্ধ হচ্ছে।'

'তো গাঁউলি লা-লৌকার কি!' ছেলেদের বিশ্বাস করেনি পরধান। মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল। নিজের বউকে বলেছিল, 'আসল কথা, বউয়ের কাছে এসেছে ব্যাটারা—মোকে একটা আনিয়ে-বানিয়ে বলে দিলে।'

কিন্তু কথা যে বানানো নয়, পিয়ন জানকীনাথ তার অনেক খবর দিয়ে গেল একদিন। বাঙলার সীমান্ত তখন ফাশিস্ত জাপান আক্রমণ করেছে। সমুদ্রতীরবর্তী সমস্ত আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ তখন নষ্ট করে দিচ্ছে সরকার। যত নৌকো ছিল ভাঙছে সব, ডুবিয়ে দিচ্ছে অথবা বাজেয়াপ্ত করছে—পাছে শত্রুপক্ষ তাকে করায়ত্ত করে ফেলে।

দাঁড়ি মাঝি বেকার দুই ছেলে তাকিয়ে ছিল বাপের চিন্তাকুটিল মুখটার দিকে।

পরধান আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, 'চুলোয় যাক্ লৌকা—মা বসুন্ধরা আছে, ভাবিসনি। এ সন আরও দুটা লাঙল বাড়িয়ে দেব।'

ছেলেরা বলেছিল, 'কিন্তু জমিন ? জমিন কোথায় তোমার ?'

'দেখি জমিদারকে বলে কয়ে—আরও দশটা বিঘা যাতে বাড়ে।'

কিন্তু মৌসুমী নামার অনেক আগে একদিন ডুগডুগ্ করে ঢোল বেজে উঠল ঘুঘুডাঙার মাঠের পাশে। ঢুলির আগে আগে চলেছে দুজন চৌকিদার—আউড়ে যাচ্ছে একটানা মুখস্ত বুলি। কোনো কথার জবাব দেয় না, জিজ্ঞেস করলেও একটা অন্য কথা বলে না। কে যেন দম দিয়ে কলের পুতুল ছেড়ে

দয়েছে। গ্রামের লোক কিছু না বুঝতে পেরে ছুটে এল পরধানের কাছে—তাদের মুরুব্বি মাতব্বর।

'হায় পরধান—গ্রাম ছেড়ে যেতে বলছে যে! এ কি হল পরধান—মোরা কিছু বুঝতে পারলম না?'

'গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলছে! সবাইকে?'

'হাঁ গো পরধান!'

'অমনি বললেই হল!'

'বলছে তো পরধান!'

'চল তো—দেখি! মগের মুল্লুক!—'

মগের মুল্লুকই! ঘুঘুডাঙায় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হবে। গ্রাম ছেড়ে পনেরো দিনের মধ্যে চলে যেতে হবে পাঁচ মাইল তফাৎ।

'কী হবে পরধান—বল বল! কোথায় যাই মোরা সাত পুরুষের ভিটা ফেলে—হায় পরধান।' গ্রামের মেয়েমরদ ঘিরে ধরে পরধানকে।

তাদের মুরুব্বি—তাদের মাতব্বর! এতদিন সমস্ত ভালো-মন্দে যে আদেশ নির্দেশ দিয়েছে, একটা কথাও বলতে পারেনি সেদিন। বরং হতবুদ্ধির মতো তাকিয়েছিল সকলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে।

দেখতে দেখতে ঘুঘুডাঙার মাঠের পাশে পাশে পড়তে লাগল তাঁবু। ঠিকাদার কনট্রাক্টার এসে সাহেব ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কি সব মাপ-জোক করে গেল একদিন। উঁচু ডাঙায় ঘর উঠতে লাগল সারি সারি—বাংলোর মতো। ট্রাক বোঝাই করে আসতে লাগল বিদেশী সৈনিকের দল—আর রাইফেল স্টেনগান এ্যান্টিএয়ারক্রাফ্ট গান। ঘুঘুডাঙার চাষাভূষো ভয়ে ছিটকে পালাল কে কোথায়!

শেষ ভাঙলো পরধানের পরিবারও—পুরো একদিন নিখোঁজ থাকার পর পরধানের বাইশ বছরের বিধবা মেয়ে বাতাসী যেদিন ঘরে ফিরে এল। ফিরে এল আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে—যেন জোরে হাঁটতে পারছে না। কাপড়ে রক্তের দাগ। গালটাকে যেন খাবলে খেয়েছে। সর্বাঙ্গে আঁচড়-কামড়—যেন কোথায় কোন কাঁটা বনে ঢুকেছিল। মেয়েটা এসেই পা জড়িয়ে কেঁদে উঠেছিল হাউমাউ করে।

'মোকে ধরে রেখেছিল ওরা—ধরে রেখেছিল বাবা! গুলী করে মেরে ফেলবে বলেছিল।'

পা-টা জোরে টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল পরধান, 'তবে তুই মরে গেলিনি কেন কালামুখী—সেইখানে মরে গেলিনি কেন! দূর হয়ে যা মোর চোখের সামনে থেকে—পালা পালা।' তেড়ে গিয়েছিল পরধান।

আর একটি কথাও বলেনি বাতাসী। দাওয়ার এক কোণায় চুপ করে বসে চোখের জল ফেলেছিল কিছুক্ষণ। ভাইরা কঠিন পাথর, মার চোখে ভয়। পরধানের ওপরে কথা বলার অধিকার কারো নেই। এক সময়ে কখন চলে গিয়েছিল মেয়েটা। পরের দিন সকাল বেলা দেখা গিয়েছিল—গ্রামের বুড়ো বটের ডালে গলায় শাড়ীর ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে বাতাসী।

এই ব্যাপারের পর বড় দুই ছেলে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তাদের সোমত্ত বউ। তারা জল আনতে যায় দীঘিতে—সৈনিকেরা হাসে, ইসারা করে। ন্যাংটো হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দীঘির জলে।

পরধান হুকুম দিল, 'মেয়েরা কেউ বেরুবে না ঘর থেকে।'

বড় ছেলে বললে, 'ঘরে এসে মেয়েমানুষের ওপর যদি হামলা করে!'

পরধান চটে বলেছিল, 'তবে তুই পালা তোর মেয়েমানুষ কাঁধে করে।'

'যাবই তো।' বড় ছেলে বলেছিল, 'অত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল—তবু তুমি গাঁ ছেড়ে যাবে না।'

'ওরে যাবি কোথায় বল!' পরধান ব্যাকুল হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল শেষকালে, 'সাত পুরুষের ভিটে ফেলে যাবি কোথায়, খাবি কি! কী দিবি অতগুলো মানুষের মুখে!'

'ত্যাখো গা, তোমার মাঠে দুরমুস পিটছে গোরারা—উড়ো জাহাজ নামবে। বউ বেচে হাওয়া খেতে হবে এখন বসে বসে।'—সে গরগর করতে করতে বললে, 'আমি চললাম, মোর স্পষ্ট কথা।'

'তবে যা তুই হাঘোরের মত বেরিয়ে।'

বড় ছেলে সত্যিই চলে গেল একদিন। তার পরেও কিছু দিন মাটি কামড়ে পড়েছিল পরধান। শেষ পর্যন্ত ঘর-দোর ভেঙে জোর করে তুলে দিল তাকে।

গ্রাম ছেড়ে যেতে যেতে পথে দেখা হয়েছিল পিয়ন জানকীনাথের সঙ্গে। জানকীনাথ বলেছিল, 'শেষ পর্যন্ত তুমিও চললে পরধান—এ্যাঁ—তুলে দিল তোমাকেও?'

ঘুঘুডাঙার মুরুব্বি মাতব্বর লজ্জায় রাগে ভালো করে কথা বলতে পারেনি। শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওরা কোন্ দেশী লোক পিয়ন!'

'শুনেছিলাম মার্কিন মুলুকের লোক।'

'সে কোথায়?'

'আরি ব্বাপ্। সে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার।'

পরধান শুধু একটা খিস্তি করে উঠেছিল। বুড়ো চোখে জল এসে পড়েছিল অপমানে—অভিমানে: সে এ গাঁয়ের মাতব্বর! শেষ পর্যন্ত মোটঘাট কাঁথা চ্যাটাই নিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে ছেলে বউয়ের হাত ধরে হাঘোরের মত!

ছোট ছেলেটা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় যাব বাবা?'

'চল হাটখোলায়। তারপর ভগবান যে আশ্রয় দেয়।' বলতে বলতে ঝর ঝর করে জল নেমে এসেছিল চোখের কোণে। সামনে সন্ধ্যা। গোরু বলদ

কোথায় তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেছে। লাঙলগুলো ভেঙে দিয়েছে আছড়ে আছড়ে। বীজধান ছড়িয়ে দিয়েছে মাটিতে। সর্বহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিল পরধান। পেছনে তখন বুনো শেয়ালের মত হাউ হাউ করছে বিদেশী সৈনিকেরা। গান ধরেছে এক সঙ্গে কয়েকজন। ওদের জাতীয় সংগীত :

Oh, thus be it ever when freeman shall stand,

Between their lov'd homes and the war's desolation !

Blest with vict'ry and peace, may the heaven rescued land

Praise the Power that hath made and preserved us a nation !

And the star-spangled Banner in triumph shall wave

O'er the land of the free and the home of the brave !

গানের ভাষা জানে না পরধান। শুধু ওদের ফেটে পড়া কণ্ঠের উদ্ধত আনন্দের বিরুদ্ধে সেদিন সে বুক ভরে নিয়ে গিয়েছিল জমাট অভিসম্পাত।

আস্তে আস্তে দুর্দিন ঘিরে এল ঘনঘোর হয়ে। ধান চালের দাম বেড়েই চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। চাষবাস উঠে গেছে পরধানের—তিনটি খাটিয়ে ছেলে মজুর খাটতে যায় ঘুঘুডাঙার সেনা-শিবিরে। এরোড্রোম হচ্ছে, ঘর হচ্ছে, শালের খুঁটি পুতে হচ্ছে অবজারভেশন পোস্ট। শহরের রীতিমত একটা ছোটখাট সংস্করণ। ছোট ছোট কোয়ার্টার—কুঠি। এর মধ্যে মেজ ছেলে ফিরে এল একদিন হাত ভেঙে—বড় বড় শালের খুঁটি পুঁততে গিয়ে কেমন করে চাপা পড়ে গেল সে। হাতটা ভেঙে গেল।

কাজের লোক কমে গেল আরও একজন। বড় ছেলে বউ নিয়ে আগেই চলে গেছে কোথায় না কোথায়—দুটি ছেলে ছোট, তারা কর্মক্ষম নয়। শুধু সমর্থ দুটি ছেলের ওপরে পড়ল গোটা উপার্জনের ভার। হঠাৎ তারাও একদিন বিদ্রোহ করে বসে। তাদের আক্রোশ মেজ ভাইয়ের ওপরে—শুয়ে শুয়ে শুধু

খাচ্ছে সে। পরস্পরকে গালাগাল করতে থাকে তারা—চড়তে থাকে রাগ। তারপর টুঁটি চেপে ধরে এ ওর।

'আমি খাটিনি! আমি খাওয়ানি তোদের খেটে!' ছুটে গিয়ে মেজ ভাই ভালো হাতটা দিয়ে চেপে ধরে গিয়ে সেজ ভাইয়ের চুলের ঝুঁটি।

সেজ ভাই উল্টে টুঁটি চেপে ধরে তার। ছোট ভাই লাথি কষায় পেছন থেকে।

'ওরে মেরে ফেললে রে—মেরে ফেললে।'—মেজ ভাই চেঁচায় প্রাণপণে।

এর মাঝখানে পরধান এসে দাঁড়ায় অসহায় হয়ে—সামলাতে পারে না কোন ছেলেকেই। কোথায় গেল তার নবান্নের দিনের হাসি উছলানো সংসার! দুর্দিন দুর্ভিক্ষের ভেতর দিয়ে একটা হিংস্র স্বার্থপর জানোয়ার যে কোন্ ফাঁকে এসে প্রত্যেকের বুকের ভেতর বাসা বেঁধেছে।

পরধান বাঁচাতে গেল মেজ ছেলেকে! অন্য দু-জন খাটিয়ে ছেলে মার্ মার্ করে ছুটে এল বাপেরই দিকে। একজন কোথা থেকে একটা লাঠি এনে বসিয়ে দিল পরধানের মাথায়।

'তুমি শালা বুড়ো যত নষ্টের গোড়া। মোরা খাটব—পেট ভরে খেতে পাবনি। আর তুমি ওদের খাওয়াবে বসিয়ে বসিয়ে।'

ছোট ছেলে বললে, 'আমি আর পারব না, যে যার খাটো—খাও।'

সেজ ছেলে বললে, 'আমার কি দায়। যে ছেলের জন্ম দিয়েছে—সে-ই খাওয়াবে। আমি চললাম।' চলে গেল খাটিয়ে দুই ছেলে। ভাঙা হাতটা নিয়ে মেজ ছেলেও একদিন বউ ফেলে চলে গেল কোথায় না কোথায়। তার বউটা কয়েক দিন মুখ বুজে পড়ে রইল শ্বশুরের দিকে চেয়ে। কিন্তু বুড়ো মানুষ—কোথায় পাবে কাজ, কোথায় পাবে খাদ্য! শেষ তক্ বউটা ভিড়ে গেল একদিন সৈনিকদের লালসার ভোজে।

শেষ পর্যন্ত পরধানও গেল একদিন সেইখানে—সেনা-শিবিরের কাজে। অনেক লোকজন কাজ করছে—শুধু তার ছেলে দুটি নেই, চলে গেছে অন্য কোথায়।

বুড়ো পরধান দাঁড়াল গিয়ে একটি পাহারাদার গোরার সামনে। বললে, 'মোকে কাজ দাও সাহেব।'

গোরা শান্ত্রী কয়েকবার দেখল তাকে আপাদমস্তক : পরধানকে দেখাচ্ছে পাগলের মত। বুড়ো—অক্ষম—উদ্‌ভ্রান্ত।

কয়েকজন ছোকরা সৈনিক হেসে উঠল হো-হো করে। একজন বললে, 'বিবি হ্যায়—বিবি?'

ছিল—তার বিবি ছিল, হাটখোলার চালায় মরে গেছে একদিন কচি দুটো ছেলের সঙ্গে সঙ্গে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাতালের মতো টলতে টলতে ঝিম মেরে ফিরে এসে বসেছিল সে সেই বুড়ো বটের তলায়—যার ডালে একদিন বিধবা মেয়ে বাতাসী ফাঁস দিয়েছিল গলায়। গাছের শেকড়ে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল পরধান। ঘুমের মধ্যে মনে হয়েছিল, কে যেন ডাকছে তাকে : 'বাবা—অ বাবা!'

'উঁ।'

চোখ ঘষে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল পরধান। চেয়ে ছিল ফ্যাল ফ্যাল করে—চিনতে পারছে না যেন মেজ ছেলের বউ মানীকে। কেমন যেন মনে হচ্ছিল—মেয়েটা যেন বাতাসী।

মানী বলেছিল, 'খাবে বাবা?'

খাওয়া? কতদিন খায়নি সে!

মানী কাপড়ের ভেতর থেকে একটা বড় পাঁউরুটি বের করে আধখানা ছিঁড়ে গুঁজে দিয়েছিল তার হাতে। আর আধখানা খেতে শুরু করে দিয়েছিল সে নিজে।

'খাব !' বোকা বোকা চোখে চেয়ে বলেছিল পরধান।

মানী বলেছিল, 'হ্যাঁ—খাও এইখানে থাকো—কোথাও যেয়োনি আর। বুড়ো মানুষ।'

আধখানা ছেঁড়া পাউরুটির দিকে চেয়ে চেয়ে মনে পড়েছিল শুধু বাতাসীর কথা: এই বুড়ো বটের ডালে জানোয়ারে কামড়ানো দেহটা তার হাওয়ায় একদিন দোল খাচ্ছিল না। ···

রুটিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থু-থু ক'রে থুতু ছিটিয়ে গোঁ ভরে চলে গিয়েছিল সে কোথায় না কোথায়। বছরের পর বছর। ···

৩

অন্ধকারে একটা চাপা গোঙানো কান্না ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে। হঠাৎ মনে হয় পরধানের—এ যেন সেই নিঃশব্দে গলায় দড়ি দেওয়া বাতাসীর গুমরানো কান্না—একদিনের মরে যাওয়া ঘুঘুডাঙার কান্না !

'বাবা গো'···

'কে আছ—কে আছ, বাঁচাও।'

অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে বহুক্ষণ বসে রইল পরধান। কান্নাটা বেড়েই চলেছে।

টঙের বাইরে এসে দাঁড়াল পরধান। কান পেতে শুনল কিছুক্ষণ। ঘুমন্ত গ্রাম—নীরব, মনে হচ্ছে জনহীন। তার নিরবলম্ব জীবনের মতই সবটা ফাঁকা কলকাকলিহীন। বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এই বারোটি ছেলেমেয়ের বাপ—ঘুঘুডাঙার নিঃসঙ্গ মাতব্বর, মুরুব্বি।

কান্না লক্ষ্য করে তারপর এক পা এক পা করে এগোতে লাগল পরধান।

কাঁদছিল ভূতি। প্রসব-বেদনায় থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছে বোবা জানোয়ারের মত। দূরে দূরে টঙগুলি সব নীরব নিঃসাড়। গজেনও টঙের

মধ্যে মুখ বুজে শুয়ে আছে। বেরোবার সাহস নেই কারো। ভুতি বাইরে পড়ে পড়ে চেঁচাচ্ছে।

পরধান গিয়ে হাত ধরে তুললো ভুতিকে। বললো, 'পারবি যেতে মোর টঙে? চল—আস্তে আস্তে চল মা। কাঁধ ধর মোর—কাঁধ ধর।'

'তুমি! পরধান—তুমি এলে! ওগো মোর বাপ গো!'—ভুতি পরধানের পায়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো।

'ওঠ মা—ওঠ।' পরধান হাত ধরে তুললো ভুতিকে।

পরধানের গলা শুনে হকচকিয়ে গজেন বেরিয়ে এল টঙ থেকে। তারপর দেখে থমকে দাঁড়াল। অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'পরধান, তুমি!'

'হ্যাঁ—আমি।' পরধান শুধু বললে, 'মোর ঘর ফাঁকা গজেন—মোর তো সব গেছে। আজ থেকে ভুতি রইল মোর ঘরে।'

গজেন হঠাৎ যেন হতবুদ্ধি হয়ে যায়। নীরবে অনুসরণ করে চললো ওদের।

পরধান বললো, 'একটা জানাশোনা মেয়ালোক হলে ভালো হত গজেন। এর ছেলে হবে।'

গজেন বললে, 'আমি বনমালীর বউকে ডেকে দিচ্ছি পরধান—সে সব জানে।'

এতক্ষণে সাহস পেয়ে যেন হুড়মুড় করে ছুটে এল মেয়েরা। জড়ো হল এসে পরধানের টঙের ভেতরে। মরদেরা বসে রইল বাইরে পরধানের সামনে। কেউ আর কোন কথা বলছে না। থেকে থেকে ফেটে পড়ছে শুধু ভুতির চিৎকার। দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে পরধান।

ছেলে হল শেষ রাত্রির দিকে। ভুতির চেঁচানি থেমে গেছে। তার জায়গায় নতুন একটা গলা শোনা যায় অন্ধকারে : ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—

খুব বিচলিত দেখায় পরধানকে। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল বনমালীর বউ?'

'ছেলে গো—টুকটুকে ছেলে!'

'ছেলে!' পরধানের গলায় খুশি আর বিস্ময়। বুড়োর মুখে যেন জনকের আনন্দ আর গর্ব। যে কজন মেয়ে মরদ জড়ো হয়েছিল সেখানে তাদের লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'আজ থেকে জেনে রাখ সবাই—আমি ও ছেলের বাপ হলাম, ওকে দেখবে মোর ব্যাটার মত—মোর ধর্মের ব্যাটা।' ...

তারপর প্রাণোচ্ছল হাস্যমুখর একটা নতুন আবহাওয়ায় কোথায় হারিয়ে যায় অনুর্বর মরা ঘুঘুডাঙার কথা। এরই একপাশে তখনো মুখ গোমড়া করে ভারি হয়ে বসে আছে পুরানো সেনাবারিক, বিরাট বিরাট শালের খুঁটি দিয়ে তৈরি করা স্কাই স্ক্রেপারের মত, অবজারভেশন্ পোস্ট আর সারিবদ্ধ বাংলো। সেখানে বাড়ছে আগাছা জংগল। সেদিকটায় কেউ যায় না। সে অংশ মালিক বেচে দিয়েছে সরকারের কাছে। দাঁড়িয়ে আছে ভুতুড়ে সরকারী ঠাট। যুদ্ধের পরে জন্মেছে যে সব ছেলেমেয়ে তারা সভয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে পোড়ো ঘরগুলো। কেউ মাড়ায় না তার ত্রিসীমানা। কেমন একটা আতঙ্ক যেন চেয়ে আছে সেখানে গভীর চোখ মিলে। মালিক নতুন করে প্রজাবিলির সময় হুঁশিয়ার করে দিয়েছে: 'খবর্দার—ওদিকে যাবে না কেউ, ছোঁবে না একটি জিনিস। ও আর তোমাদের নয়'

সেই দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ কখনো থু-থু করে থুতু ছিটোয় পরধান: বিড় বিড় করে কি যেন বলে ওঠে বোঝা যায় না।

এমনি করে বর্ষা কেটে শরৎ এল একদিন। পাকা ফসলের আসন্ন দিন।

পরধান গ্রামের জোয়ান ছেলেদের একদিন ডেকে বললে, 'মোর একটা নতুন ঘর তুলতে হবে গো। ওই ছোট্ট একটুন টঙের মধ্যে মোর ব্যাটার আর ধরছে না বাবু।'—

'বেশ তো পরধান—মোরা খেটে দেব।' একজন ছোকরা বললো, 'কবে আরম্ভ করবে বল।'

'যেদিন তোমরা আসবে।'—

'বেশ—তবে কাল থেকে।'—

পরের দিন থেকে সুরু হয়ে গেল মাটির দেয়াল হৈ-হাল্লা করে।

প্রতিদিন দেয়াল উঠতে লাগল একটু একটু করে—আর স্বপ্ন যেন ভেঙে পড়তে লাগল বুড়ো লোকটার আনন্দ উজ্জ্বল চোখে। মাঠে ধানগাছগুলি ডগমগিয়ে উঠেছে—সেখানকার স্বপ্ন আর ঘরের কোণে একটা কচি নির্বোধ সুখের স্বপ্ন। সবটা মিলিয়ে পরধান যেন ঝিমোয় আফিংএর নেশায়। কোন্ অনাগত নবান্নের দিনের আনন্দ কলধ্বনি ওঠে দাওয়া ভরে—উঠোন ভরে। বার্ধক্যের আগামী অনাগত দিনগুলিও হয়ে উঠে অর্থপূর্ণ—প্রশান্তিতে ভরা। জীবনের দুর্জয় বাসনা আবার রঙিন সুতোর জাল বোনে যেন ঘুঘুডাঙার আকাশে, মাঠে, ঘরে।

দেয়াল শেষ হয়ে একদিন খড় উঠলো চালায়। পরধান কচি ছেলেটাকে কোলে করে দেখছে ঘুরে ঘুরে। এমন সময় পেছন থেকে পিয়ন জানকীনাথের গলা শোনা গেল বহুদিন পরে।

জানকীনাথ বললে, 'কোলে কে গো পরধান!'

'মোর ব্যাটা।' পরধান হেসে বললো, 'ব্যাটার জন্যে নতুন ঘর করছি পিয়ন।'

'ভালো', জানকীনাথ হেসে বললো, 'কিন্তু আবার যে যুদ্ধ বাধলো পরধান।'

'কি বললে!' এক মুহূর্তে মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে পরধানের। এগিয়ে গেল দু-পা পিয়নের দিকে।

চালায় যারা খড় বসাচ্ছিল—থেমে গেল তারাও। হাত থেকে খসে পড়ল খড়ের গোছা। উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইল পিয়নের দিকে।

'আবার যুদ্ধ!' পরধান বললো, কেমন বিহ্বল হয়ে।

জানকীনাথ হেসে বললো, 'হ্যাঁ গো পরধান—আবার যুদ্ধ লাগে-লাগে।'

কোথায় কোন দেশান্তরে আবার ধোঁয়া উঠছে ঘর পোড়ার—ফেটে পড়ছে কামানের গর্জন আর মানুষের আর্তনাদ, খবরের কাগজ আর বাবু-ভায়াদের মুখে শোনা নানা কথার গল্প করে পিয়ন জানকীনাথ।

পরধান ঘোলাটে চোখে চেয়ে রইল পিয়নের দিকে। আস্তে আস্তে বুড়োর মুখের লোল চামড়ার যেন কাঠিন্য ফিরে আসে। একটা মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ওর ঘোলাটে চোখের ফিরিয়ে আনে দীপ্তি। ওর দাঁত চেপে বসে দাঁতে। ওর আপন ভাগ্যকে প্রতিরোধ করবার জন্যে মনে মনে ও যেন তৈরি হচ্ছে আবার। অজানতে তার কর্কশ হাতের কঠিন থাবা জোরে কখন চেপে ধরেছে কচি ছেলেটাকে। ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। এর পরে যেন সম্বিৎ ফিরে এল পরধানের। হঠাৎ সে পাঁচ-সাত বছর অতীতে গিয়ে পড়েছিল—ক্ষেপে গিয়েছিল: সে মাতব্বর—ঘুঘুডাঙার সে মাতব্বর না!

একটু আদর করল বাচ্চাটাকে। ছেলেটার মুখে আবার হাসি ফিরে এসেছে। ওর ছোট ছোট নির্বোধ চোখ দুটোতে প্রতিফলিত হয়ে ঝকমক্ করছে বিকেলের সারা আকাশের স্নিগ্ধ আলো। কচি কচি হাত দুটো মুঠো করে কি যেন ধরতে চাইছে শূন্যে। পরধান অন্য মনে চেয়ে রইল শিশুটার দিকে। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অস্ফুট কণ্ঠে বিড় বিড় করে বললো, 'আবার যুদ্ধ!'

গুঁড়ি মেরে আসছে আবার একটা সর্বনাশ।

তামাক খেয়ে জানকীনাথ চলে গেল। পরধান শূন্য চোখে চেয়ে রইল ঘুঘুডাঙার মাঠের দিকে, গাছের ছায়ায় গড়ে তোলা নতুন টঙগুলোর দিকে। চোখে ভাসে ঘুঘুডাঙার নতুন ঘর বসত, নতুন চাষ আবাদ।

চালের ওপরে থমকে গেছে ঘরামীরা। তারা নেমে এল চালা থেকে।

ঘিরে বসল পরধানের সামনে। একটি ছোক্‌রা মত চাষী প্রতিধ্বনি করল যেন পরধানের কথার, 'আবার যুদ্ধ পরধান! মোরা বন কাটলম, আবাদ করলম, ঘর গড়লম যে!' —

পরধান তার ফ্যাকাসে মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল—কিছু বলতে পারল না। এবং তাই যেন চটে গেল মনে মনে: সে মাতব্বর—নতুন ঘুঘুডাঙার মাতব্বর না সে! কিছু তার বলা উচিত। কিন্তু কিছুই সে বলতে পারলে না। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে একটা গালাগালি দিল।

একজন বলে উঠলো, 'মোরা শুধু উলুখড়।—পুড়ে মর সব শালা।'

ওদের হতাশ কণ্ঠ, ওদের দীর্ঘশ্বাস, ওদের ফ্যাকাসে মুখ, সবটা ক্ষেপিয়ে তোলে যেন পরধানকে আবার। সেই ভুলে যাওয়া ক্ষুধা আর মৃত্যু। চোখের সামনে দিয়ে ঝড় বয়ে গেল যেন কয়েকটা বছরের: বাতাসী ··· বিদ্রোহী ছেলেরা ··· মানী ··· সেই এক টুকরো পাঁউরুটি। মাঠ জুড়ে গোধূলির বিষণ্ণ ছায়া অন্ধকার হয়ে আসছে। পরধান চেয়ে দেখলো—ম্লান অন্ধকারে মাথা তুলে আছে ঘুঘুডাঙার নতুন আবাদের পাশে শালের খুঁটির স্কাই-স্ক্রেপার, ভুতুড়ে অবজারভেসন পোস্ট—সারি সারি সেনাবারিক। ক্ষ্যাপা গলায় পরধান বলে উঠল: 'ওই শালার কাগ-বাসায় আগুন দিয়ে দিতে পারবি—পারবি তোরা? অমনি শালার যেখানে যত কাগ-বাসা আছে—'

উত্তেজনায় থেমে গেল পরধানের গলা। সবাই বসে রইল চুপ করে। পরধান উঠে পায়চারী করতে লাগলো তার নতুন দাওয়ায়। ক্ষ্যাপাটে বুড়ো বুড়ো পদক্ষেপ।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। ঘরপোড়া গোরুর মত ওরা আর একটি যুদ্ধের সিঁদুরে মেঘের দিকে চেয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ওরা দাওয়া থেকে একে একে নেমে চলে গেল। গেল বটে কিন্তু ওদের

সেই ফ্যাকাসে মুখের কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো বুড়োর কানে কানে : মোরা বন কাটলম, আবাদ করলম—ঘর গড়লম যে। পরধান পায়চারী করতে লাগল অস্থির ভাবে। ঘুঘুডাঙার মাতব্বর সে, কোনো আশা আশ্বাসের কথা শোনাতে পারল না এতগুলো লোককে। ফুঁসতে লাগল পরধান। কানের কাছে তখনো গুন গুন করছে ফ্যাকাসে-মুখো সেই ছোকরা চাষীর কথাটা : 'মোরা বন কাটলম, আবাদ করলম, ঘর গড়লম যে।' না—কোনো জবাব সে ওদের দিতে পারলো না।

একটু রাত গভীর হতে না হতেই সেদিন ঘুঘুডাঙার অন্ধকার লাল হয়ে উঠলো অকস্মাৎ। আগে শোনা গেল ভুতির গলা ফাটানো চিৎকার, 'ছুটে এস সবাই কে কোথায় আছ—সব্বনাশ করে দিল পরধান গো।'

চাষীরা ছুটে বেরিয়ে এল সবাই।

ভুতি বললে, 'হোই আগুন লাগিয়ে দিল পরধান। বুঝিন ক্ষেপে গেল লোকটা গো। একটা মশাল হাতে করে চলে গেল কোথায় না কোথায়। আমার ভয় লেগে গেল দেখে। কিছু শুধাতে পারলম না! হায় হায় গো!'

সেনাবারিকের চালায় তখন আগুনের শিখা কাঁপছে—শিখা কাঁপছে অভজারভেশন পোস্ট-এ। মালিকের নিষেধের কথা মনে পড়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল চাষীদের মুখ।

গজেন বলে উঠল, 'হায় হায় রে! মোদের কপালে আগুন লাগিয়ে দিলে শেষটায় পরধান!'

'কিন্তু পরধান কোথায়!'

'তাইতো—দেখা যাচ্ছে না তো।'

সবাই ছুটলো আগুন লক্ষ্য করে। ছুটে ছুটে এসে থমকে দাঁড়াল পরধানের সামনে। পরধান চেয়েছিল আগুনের দিকে—ক্ষ্যাপা চোখে একটা পরিতৃপ্তির

আভাস। বসে আছে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। ঝলসে গেছে মুখটা আগুনের হলকায়। নিঃশ্বাস নিচ্ছে কষ্টে। তার এ দুর্ঘটনার দিকে প্রথমে চোখ পড়ে না কারো।

একটি চাষী হাউমাউ করে বলে উঠল, 'এবার মোদের উৎখাত করে দেবে যে পরধান—এ কি করলে তুমি! মোদের যে নতুন আবাদ—নতুন বসত!'

'কাগ-বাসায় তাই তো আগুন দিলাম গো। মোদের নতুন আবাদ—নতুন বসত যে!' পরধান ওর ঝলসানো মুখে বিষন্ন একটা হাসি টেনে বললে আস্তে আস্তে—দম চেপে চেপে, একটা অসহ্য যন্ত্রণাকে চাপা দিয়ে।

গজেন সভয়ে বললো, 'সব যে ছাই ভস্ম হয়ে গেল পরধান!'

'সার হবে গজেন—মোদের ঘুঘুডাঙার মরা মাটির সার হবে ওতে।' বলে পরধান শেষবারের মতো উজ্জ্বল চোখে তাকাল সকলের দিকে।

সে মাতব্বর। ঘুঘুডাঙার মানুষগুলোকে এতক্ষণ পরে মনের মত একটা জবাব দিতে পেরেছে। স্বস্তিতে যেন চোখ বুজলো পরধান এবার। তারপর অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর দমচাপা একটা শব্দ খসে পড়ল শক্ত হয়ে আসা ঠোঁট থেকে। মাথাটা ঢলে পড়লো একদিকে পরধানের। বহু বছরের বহু দুঃখ ও বিপর্যয়, বহু দুর্ভিক্ষ ও শোষণের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রামের পরে শেষ পর্যন্ত যেন পরিশ্রান্ত ও জীর্ণ।

—